অবতারের অবতরণ

দীপ্তিময় রায়

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিণ্টার্স
২৬/২এ, সিমলা রোড
কলকাতা-৬।

মুখবন্ধ

এই পৃথিবী তার আলো, বাতাস, রঙ, গান আর নানারকম বৈচিত্র্য নিয়ে কত সুন্দর! দূরের নীলাকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা ও আমাদের নাগালের বাইরের ব্রহ্মাণ্ড চরাচরের কত অজানা বৈভব কতই না রহস্যভরা! একটা সুসংবদ্ধ নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা নিয়ে চৈতন্যময় সত্তার অনুরণনে ও অভিব্যক্তিতে গতিময় ছন্দে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলমান। কোথায় চলছে? কোন মোহানায়?

যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা; যিনি জগতের কারণ ও কারক তাঁরই মধ্যে সমাহিত হতে চলেছে বিশ্বের গতি আবার হয়ত চলবে নতুন চলৎশক্তির গরিমায়। বিশ্বনিয়ন্তা কিন্তু বিশ্বচরাচরে ওতঃপ্রোত—নিজেই আপন সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছেন—ভরিয়ে আছেন; আবার হয়তো আপনাকে গুটিয়ে নেবেন। চৈতন্যময় বিশ্বভূপের এ বুঝি নিজের খেলা। তাঁর এই ক্রীড়াচঞ্চল অভিব্যক্তিই কি জগৎ-জীবন চক্র?

জীব-জগতের রহস্য, তার সৌন্দর্য ও কদর্যতা উপলব্ধি করতে করতে শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ অনুভব করেছে জগৎ-স্রষ্টার অস্তিত্ব। সেই চৈতন্যময় সত্তাকে সে বলেছে ঈশ্বর —সে জেনেছে তিনি ভগবান।

তারপর ঈশ্বরকে অন্বেষণের সাধনা চলেছে তার। কে তিনি? কোথায় তিনি? কেমন তিনি?

সাধনার ফলসিদ্ধি হিসাবে মানুষ তার অন্বেষণের দিশা পেয়েছে; আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছে ঈশ্বরকে বুঝতে বুঝতে—তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে—তাঁকে অন্তরে লাভ করতে করতে। তারপর তার স্বরূপোলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মানুষ নিজেই ঈশ্বর হয়ে গেছে—অমৃতময় হয়েছে জীবনে সৎ-চিৎ-আনন্দের আবাহনে। এই আনন্দ নিকেতনে উত্তরণই মানব জীবনের লক্ষ্য। 'তিনিই আমি, আমিই তিনি' আত্মজ্ঞ পুরুষের এই পরম উপলব্ধি। এ সবই লীলাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি যাকে কৃপা করেন সেই-ই জগৎ-জীবনের রহস্য ভেঙে তাঁকে পায়। তাই মানুষের সহজে স্বরূপোলব্ধি হয় না। তাকে জন্ম-জন্মান্তরের চক্রে ঘুরতে হয়—লাভ করতে হয় সম্যক গুণ বা অধিকার যা ঈশ্বরের কৃপা।

যাঁরা ঈশ্বরে একীভূত হয়ে গেলেন তাঁরা মিলনের অসীম আনন্দের কথা, পরম পাওয়ার কথা বলতে বলতেও তা প্রকাশ করতে পারেন না। কারণ পরব্রহ্মে লীন তাঁদের আপন সত্তা থাকে কই? কিন্তু মহা ভাগ্যশালী সেই মহামানবরা মানুষের

সৌভাগ্য লাভের পথ দেখিয়ে যান। তাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য রেখে যান তাঁদের ধ্যান বা সাধনায় উপলব্ধ ঈশ্বরের কথা। তাঁরা অর্থাৎ সেই অতি মানস সত্তা বিশিষ্ট পরম প্রাজ্ঞ মহাপুরুষরা, ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁর বিশেষ শক্তিলাভ করে জন্মগ্রহণ করেন জীব কল্যাণের জন্য। তাঁরা যেন ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি হয়ে জীব জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের বাণী বয়ে নিয়ে আসেন এবং ঈশ্বররূপে প্রতিভূত হন তাদের কাছে যাদের মধ্যেও তিনি রয়েছেন ওতঃপ্রোত।

জগৎ ও জীবনের রহস্যময় এই খেলার মধ্যে দেখা যায় বহু সাধক ও ধর্ম-সম্প্রদায়ী ঈশ্বরোপাসক তাদের আত্মজ্ঞানোপলব্ধির পথে সাধারণ মানুষের বোধ-বিকাশের জন্য বা তাদের ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য, অথবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বা কেবল স্বার্থ-চরিতার্থতার জন্য ঈশ্বর সম্পর্কে দুরভিসন্ধি প্রসূত নানা উদ্ভট ও অবাস্তব কল্পনা করে আর তারই ফলস্বরূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়।

পৌরাণিক যুগে অবতার-ভাবনা এইরকম হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের চিন্তার ফসল বা পণ্ডিতমন্য মানুষের স্থূল উপলব্ধি অথবা অভিসন্ধি পরায়ণ মানুষের কল্পনা কিম্বা ঈশ্বরপরায়ণ সাধকের সত্যোপলব্ধির আলো কিনা সে বিষয় পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তবে কল্পনার রঙীন ফানুস যখন আকাশে ওড়ে তার পশ্চাতেও একটা ভাবনা থাকে—রয়ে যায় একটা পরিকল্পনার স্পর্শ যার প্রকাশকে অস্বীকার করাতো যায়ই না. কখনোও ঐ কল্পনা বাস্তবতায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

হিন্দুর অবতার-তত্ত্বের ভিতর যেমন অবাস্তব, অসামঞ্জস্যও উদ্ভট চিন্তা রয়েছে তেমনি তার ধারণার গণ্ডীও বড় সঙ্কীর্ণ। অবতার ভাবনা যদি নিছক কল্পনাই হয় তবে সে কল্পনাও বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থূল। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ চিন্তার মধ্যে এক আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত ক্রমশঃই অবতার-ভাবনার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে দেখা যায়। সঙ্কীর্ণতা ও স্থূল ধারণাকে অতিক্রম করে মিথ্যা কল্পনাকে দূরে রেখে এক পরম প্রভাময় সত্যে অবতারতত্ত্বের উত্তরণ যে হয়েছে এর সমস্ত জটিলতা ভেদ করে তা বুঝতে পারা যায়।

দীপ্তিময় রায়

রায় বাড়ী,
গরিফা, ২৪ পরগণা

উৎসর্গ

ধর্মপত্নী ডঃ ঋণা রায়কে

এই লেখকের অন্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও গরিফা।

ভাবনায় যুগপুরুষ কেশবচন্দ্র ও ভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র (২য় সংস্করণ)

স্বয়ম্ভু শিব

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ও গৌরগোবিন্দ গুপ্ত

ভারতের মুনিঋষি (১ম খণ্ড)

১

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে ও ধর্ম ভাবনায় 'অবতার বাদ' পৌরাণিক যুগ থেকে প্রচারিত হয়ে ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও অবতার বাদের উদ্ভব হয়েছে মনে হয় আরও পূর্ববর্তী যুগে। ঈশ্বর মানুষ কিম্বা যে কোনো এক বিশেষ জীবের রূপ গ্রহণ করে কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, এই ধারণা আজ বহু হিন্দু ভারতীয়র মধ্যে দৃঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট এবং সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনার আলোছায়ায় আবৃত। জগতের অন্য ধর্ম মতে ঈশ্বরের অবতারত্ব অর্থাৎ Incarnation of God সম্পর্কে ধারণা মনে হয় হিন্দু ধর্মের মতো বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে অবতারগণের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে নানা কথা-কাহিনী। সেখানে কল্পনা—কিম্বদন্তীর নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁদের পূজাপাঠ করা হয়েছে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মকৃতির কথা এবং জাগতিক জীব-জীবনের বিকাশ ও মুক্তির পথও তাঁদের উপদেশের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। এর দ্বারা অবতার সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন এই অবতার ভাবনাকে কেন্দ্র করে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে মুনিঋষি বা অধ্যাত্ম সাধকগণ তাঁদের ধ্যানোপলব্ধির দ্বারা জগৎ, জীবন ও ঈশ্বর সম্পর্কে যে সত্যজ্ঞান ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন তারই ফলসিদ্ধি কি অবতার তত্ত্ব? অথবা অবতারবাদ স্বার্থগন্ধী ধর্মসম্প্রদায়িক মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্পনা?

এই অনুমানের ভিত্তিতে কিন্তু একথা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে পরম-শক্তিমান ভগবান কোনো বিশেষ রূপ ধারণ করে জগৎ রক্ষার উদ্দেশ্যে

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে পারেন।

কেবল ব্যাপারটির সম্ভাবনার সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।

সাধারণ মানুষকে সত্যজ্ঞানে সচেতন করার জন্য বা তাকে ঈশ্বরপরায়ণ করার জন্য অথবা সুষ্ঠু মার্গ অবলম্বন করে তাদের মুক্তির পথে পরিক্রমণের জন্য উচ্চস্তরের মনীষীরা হয়ত বা 'অবতার বাদ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিংবা জঘন্য স্বার্থ পূর্তির জন্য কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় এ কাজ করেছে। এ ধরনের বক্তব্য বিতর্কের পথ খুলে দিলেও মনে যে একটা যুক্তি গ্রাহ্য ভাবনা জাগিয়ে রাখে তা বলা বাহুল্য। অবশ্য বিশ্বাস করার জন্য যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করতে হয় তবে যে স্বতন্ত্র কথা। কারণ 'বিশ্বাস' অনুভূতিটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যময়। কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।' বাস্তবিক এ যেন অপূর্ব এক রহস্য যে জ্বলন্ত বিশ্বাস আন্তর-ভাবনাকে জীবন্ত করে তোলে। কে বলতে পারে আত্মশক্তি তরঙ্গের এ এক অপূর্ব অভিব্যক্তি কি না!

মানুষ গভীর ধ্যান ও মননের দ্বারা উপলব্ধি করেছে যে বিরাট এক শক্তিরই অনুপম অভিব্যক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই বিরাট শক্তিই ঈশ্বর নামে অভিহিত। তিনি আপন লীলার আনন্দে বিশ্ব গড়েছেন (বিশ্বসংসার তাঁর সৃজন লীলার অভিব্যক্তি) আবার জগতেরই মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছেন। তাই তিনি জগন্নিবাস—জগৎ নিয়ন্তা। জগৎ ও জীব সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান, সবই তাঁর ইচ্ছায় গড়া। আবার যাবতীয় বস্তুর লয়ও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। এই সর্বশক্তিমান সত্তা বা মহাশক্তির আধার যাঁকে ঈশ্বর বলছি তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আপন লীলায় মেতে বহু হয়েছেন আপনারই মধ্যে আবার এক হবার অভিলাষে। এ বুঝি তাঁর লীলানন্দ।

সুতরাং লীলাময় ভগবানের বিভূতি নানাভাবে নানারূপে ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। তিনি যদি মনে করেন তাঁর সৃষ্ট জগতকে ধ্বংস করবেন তবে অচিরাৎ তা করতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করবেন, তাকে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত রাখবেন অথবা তার পরিবর্তন করবেন

তবে অনায়াসে সেই সে সব করতে পারেন। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস বা স্থিতি আপেক্ষিক ভাবে হলেও যথার্থভাবে কোনো কিছুরই লয় বা স্থিতি নেই। সমস্ত কিছুই তো তাঁর মায়া প্রসূত। তিনিই তো একমাত্র অস্তিত্বময় সত্তা। ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ ; তিনি শাশ্বত, অক্ষয়, অজর ও অব্যয়। জগতের ধ্বংস বা গঠন, জগতের ক্ষয় বা রক্ষণ এ সবই তাঁর মায়া।

তাই বিভিন্ন অবতার রূপে ভগবানের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি অসম্ভব বলে মনে হয় না। আবার রূপকের আড়ালে সেই অবতার কাহিনী পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েও থাকতে পারে। তাই অবতার-তত্ত্বের আলোকে ঈশ্বরের অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া যেমন অসম্ভব নাও হতে পারে তেমনি সাধারণ মানুষকে সত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এগুলি এক একটি রূপক বা কল্পকাহিনীও হতে পারে। কিন্তু দেখা যায় এই এই সকল কাহিনীর অনেকগুলিতেই বিসদৃশ ব্যাপার, বিরূপ আচরণ, স্বার্থ সম্পৃক্ত বক্তব্য ও অন্যায় কথা বলা হয়েছে যা স্বীকার করা চলে না এবং জঘন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়।

কোনো কোনো মহাপুরুষকে আমরা 'পূর্ণ ব্রহ্ম বা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে উল্লেখ করি, যেমন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। আবার অনেকে বলেন যিনি যত বড়ই হোন, যত বড় ব্রহ্মবিদ বা পরব্রহ্মবিদ হোন না কেন পূর্ণ ব্রহ্ম বা সাক্ষাৎ ঈশ্বর কেউ নন। ঈশ্বর স্বয়ং সম্পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্ম বা সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপে যাঁদের ধারণা করা হয়েছে তাঁরাই কি অবতার ?'

কে অবতার আর কে অবতার নয় এসব প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ চলতে পারে ; স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতার আবিলতা নিয়ে 'অবতার' বাদের পত্তন হয়ে থাকতে পারে ; তবু উপলব্ধির তারতম্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে অবতারতত্ত্ব কল্পনার আশ্রিত হোক বা কোনো স্বার্থ চরিতার্থতার জন্যই হোক, এর ভিতর থেকে হয়ত অজ্ঞাতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই সত্য যে জগৎ সংসারের চরমোৎকর্ষতা হলো ঈশ্বরের লীলা সিদ্ধি এবং তার রূপায়নের জন্য বিশ্বপ্রাণের বিকাশ—প্রেরণায় অবতারের আবির্ভাব হতে পারে যিনি হয়তো ঈশ্বরের বিশেষ অভিব্যক্ত

কোনো অতিমানস সত্তা। অবতার কথার সরলার্থ কি? সম্ভবত অবতরণ বা অবতীর্ণ শব্দ দুটি থেকেই 'অবতার' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। অবতরণ বা অবতীর্ণ কথার অর্থ হলো উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে নামা। আপন সৃষ্ট কোনো জীবের রূপ ধারণ করে ঈশ্বরের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে বা আবির্ভূত হলে বলা হয় অবতার রূপে তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। সর্ব অস্তিত্বময় স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের সম্পর্কে এইরকম ধারণা বড়ই অদ্ভুত ও অসার মনে হয়। ভগবান জন্মগ্রহণ করেন ; মরণশীল মানুষ যাতে তাঁকে দেখতে পায়, জানতে পারে, সীমাবদ্ধ জীব যাতে সেই অসীমত্বকে ধারণা করতে পারে সেজন্য তিনি এই মর পৃথিবীতে আসেন লীলারসাস্বাদনের জন্য—এ ধারণা কি উপলব্ধ সত্য, না কেবলই কল্পনা? শাস্ত্রমতে ভগবান যে শরীরকে আশ্রয় করে লীলা করেন সেই শরীরকে 'অবতার' বলে। অব-পূর্বক তৃ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে 'অবতার' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। "অবে তৃ স্ত্রোর্ঘ-ঞ [পাণিনি ৩/৩/১২০]।"

অবতার সম্পর্কে বর্ণিত কাহিনীগুলিতেই অবতারের লক্ষণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের অবতার অযোনিসম্ভব হবেন নতুবা তাঁর জন্ম-কালে অলৌকিক ঘটনা ঘটবে। আবির্ভাবের পুণ্যলগ্ন থেকেই তাঁর বিভূতির স্বতঃই প্রকাশ ঘটবে অথচ তাঁর আপন শক্তি সামর্থ তিনি নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখবেন। প্রয়োজনে সে শক্তির প্রকাশ ঘটবে। তাঁর চালচলন সাধারণের মতো হলেও সাধারণের থেকে সর্ববিষয়েই তাঁর পার্থক্য লক্ষিত হবে। তিনি মায়া-রহিত ও ইন্দ্রিয় সমূহের প্রভাব মুক্ত হবেন। জগতের সমস্ত কিছু তাঁর জানা থাকবে অথচ তাঁকে দেখে সেরকম নাও মনে হতে পারে। কাননে সৌরভযুক্ত কুসুম ফুটলে যেমন চতুর্দিকে তার সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, মৌমাছি বা অন্যান্য জীবজন্তু সেদিকে ছুটে আসে তেমনি অবতারের আগমনের খবর দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে তাঁর কাছে আকর্ষিত করে আনবে।

অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? পুরাণাদি গ্রন্থানুযায়ী ঈশ্বর অবতার

রূপে জগতে অবতীর্ণ হয়ে মর্তভূমির দুঃখভার লাঘব করেন। অধর্মকে নাশ করে ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য (অর্থাৎ যে সকল দুঃখপূর্ণ, অন্যায়পূর্ণ ও পাপপূর্ণ কর্মের দ্বারা সাধারণ মানুষ পর্যুদস্ত হয় ও তাদের অতিক্রম করতে পারে না) এবং কোনো কেউ প্রবল অন্যায়কারী বা অত্যাচারী হলেও তাদের নির্দয়তায় সাধু সরল মানুষদের বিধ্বস্ত করলে বা বিপন্ন করলে ও জগতের অস্তিত্ব নাশের চেষ্টা করলে তার প্রতিবিধানের জন্য জগন্নিবাস, জগৎ কারণ ও জগৎ পালক শ্রীভগবান মর্তে অবতীর্ণ হয়ে জগৎ রক্ষা করেন। যুগে যুগে কালে কালে ঈশ্বর নানারূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন ও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে তিরোধান করেছেন, পুরাণের কাহিনী আমাদের এ কথা শোনায়। গীতার মহাবাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

— হে ভারত! যখন ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম প্রবল হয়, তখনই আমি জন্মগ্রহণ করে থাকি। সাধুদের রক্ষার জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। অর্জুনের প্রতি যোগেশ্বর কৃষ্ণের আত্মোপলব্ধিতে উদ্ভাসিত এই মহাবাণী। হিন্দুধর্মের এই ধারণা যুগে যুগে নানাভাবে পুরাণাদি গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের মনে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে যেমন সুবিধা তেমন ব্যাখ্যা করেছে, ঈশ্বরকে নিয়ে তেমন প্রচার করেছে।

আস্তিক যিনি (অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ) তিনি ঈশ্বরের অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া ও তাঁর অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের ব্যাপার নিঃসংশয়ে মেনে নেবেন। আবার যিনি নাস্তিক তিনি হয়ত ঈশ্বরের অবতারত্ব নিয়ে তর্ক তুলবেন। অন্যক্ষেত্রে বস্তুবিজ্ঞানী এসব ব্যাপার মানুষের নিছক কল্পনা বলেও মনে করতে পারেন। এরূপ অবিশ্বাস স্বাভাবিক। হিন্দুর মূর্তি পূজার রহস্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা

পরিষ্কার হবে। ঈশ্বর সাকার ভূত বা নিরাকার। তাঁকে যেমন ধারণা করা যাবে তিনি তেমনই প্রতিভাত হবেন। আসলে পরমেশ্বর নিরাকার ও সাকারের পারে। তাঁকে নিরাকাররূপে ধারণা করে ভজনা করলেও পাওয়া যায়, সাকাররূপে উপাসনাতেও তিনি দেখা দেন। তিনি বিশ্ব-সংসারে ওতঃপ্রোত। মূর্তি সাধনা হলো প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ মূর্তিকে ভগবানের প্রতীক ভাবনা করে তাঁর আরাধনা করা। ঈশ্বরকে এভাবে ধ্যান করে মানুষ সাযুজ্য লাভ করে, তার ঈশ্বর দর্শন হয়·কারণ জগতের সর্ববস্তুর মধ্যে রয়েছে চৈতন্যময় ভগবানের সত্তা। অবতার তত্ত্বও কি মূর্তি-ভাবনার মতো ব্যাপার ?

এখন আস্তিক, নাস্তিক ও জড় বিজ্ঞানী প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা যাক ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব কিনা। জগৎ ত্রাণের জন্য অবতাররূপেই বা তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কেন ? ঈশ্বর ভক্ত হয়ত অঙ্গুলি উত্তোলন করে প্রশ্ন করতে পারেন, "বাপু হে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয় তার বিচার করার অধিকার তোমাকে দিলো কে ? তুমি কি এতই···? ইত্যাদি ইত্যাদি।" বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয় যে এখানে আদৌ ঈশ্বরের বিচার করার ধৃষ্টতা দেখান হচ্ছে না ; যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষের অবতার সম্পর্কে ধারণার আলাচনা মাত্র করা হচ্ছে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মতানুযায়ী পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর স্বয়ং জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জগৎ কারক আবার তিনিই জগৎ কারণ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব বস্তুর মধ্যে তিনি রয়েছেন আবার বিশ্বসংসার তাঁর মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। তিনি একেশ্বর—বহুর মধ্যে রয়েছেন এক হয়ে। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নেই ; অন্য বস্তু যা কিছু সবই তাঁর অভিব্যক্তি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত হিন্দু ধর্মমতের সঙ্গে হুবহু এক না হলেও প্রায় অধিকাংশ ধর্ম মতই জানায় যে জগৎ পিতা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই যাঁর ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে সেই সৃষ্টিকে রাখতেও পারেন আবার তাকে বিনাশ করতেও

পারেন। এ সবের দ্বারা ঈশ্বরীয় সত্তার কোনো তারতম্য ঘটছে না।

উপনিষদে একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে পরব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। উর্ণনাভ যেমন নিজ দেহ থেকে সূত্র নির্গত করে জাল বোনে ও সেই জালের মধ্যেই অবস্থান করে আবার তার দেহ নির্গত সূত্রও সে গুটিয়ে নেয়, ঈশ্বরও তেমনি তাঁর মধ্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তিনি ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন। তাই সৃষ্টি রক্ষার জন্য অর্থাৎ তাঁর লীলা পুষ্ট করার জন্য পরব্রহ্ম ঈশ্বর যে কোনো রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেন এবং তা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যিনি জগতের সমুদয় শক্তির আধার, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাঁর এ অভিব্যক্তি সম্ভব না হওয়ার কারণ নেই। জগতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে সে সমস্তই তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে। সুতরাং আস্তিক মতানুসারে ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব এবং সেই অবতার-রূপ ঈশ্বর অভিপ্রেত যে কোনো রূপ গ্রহণ করেই মূর্ত হতে পারে অথবা মানুষের জ্ঞানের বাইরের বস্তুও হতে পারে।

যারা নাস্তিক অথবা যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায় না তারা অবতারবাদ নাও মানতে পারে। কিন্তু তারা যদি যুক্তি নির্ভর হয় তবে যুক্তি সহকারে অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে সে ক্ষেত্রে কিছু আলোকপাত হয়তো করা যেতে পারে।

গভীর তপস্যার মধ্যে মানুষের আন্তরিক ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ মূর্ত হয়ে ওঠে। যদি নাস্তিক মনে করে যে নিপীড়িত মানুষের ব্যাকুল ক্রন্দন ঈশ্বর শোনেন না (কারণ সে মনে করে ঈশ্বর বলে কেউ নেই) তবে এ যুক্তি সে হয়ত মানবে যে মানুষের প্রাণের একান্ত বাসনা ও তার প্রাণের ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ একীভূত হয়ে সৃষ্টি করতে পারে মহাশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি—মিলিত মানস সত্তার গর্ভ থেকে সৃষ্ট কোনো অতিমানস সত্তা। এই অতিমানস সত্তার আবির্ভাব হয় জগতের অশুভ শক্তিকে ম্লান ও উচ্ছেদ করতে এবং মানবের বিকাশের জন্যই। তবে কি এই অতিমানস সত্তাই অবতার? পুরাণ ও হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্র কিন্তু এ কথা জানায় নি।

শক্তির রহস্যময় অভিব্যক্তি মনে হয়তো সহজে গ্রাহ্য হয় না কিন্তু জগতের স্থিতিশীলতা বজায় ও তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্যই এর প্রকাশ সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বস্তুবিজ্ঞানীরাও যদি মহাজাগতিক শক্তির অবিনাশত্ব সম্পর্কে ধারণা রেখে জাগতিক বিভিন্ন শক্তিই যে সেই মূলীভূত মহাশক্তিরই অংশ সেটি বিবেচনা করে এবং তাদের পরিবর্ধন ও মিলনের ফলে শক্তির যে বিকাশ ঘটে তা অনুভব করে, তবে তাকেই কি অবতার শক্তি বলা যায়?

মূল কথা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের পক্ষে কোনো বিশেষ রূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হলেও সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ যে হতে পারে না তা নয়। ঈশ্বরের লীলা বিকাশের জন্যই তাঁর অবতারত্ব অনেক পণ্ডিত এ কথাও বলে থাকেন। আপন সৃষ্টি রক্ষার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। অথবা মহাজাগতিক শক্তির মহিমাময় অভিব্যক্তি হলো অবতারত্ব। কিন্তু একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। ঈশ্বর যদি জগতের স্রষ্টা, জগন্নিবাস ভগবান যদি বিশ্বচরাচরের সঙ্গে ওতঃপ্রোত, তাঁরই ইচ্ছায় যখন জগতের স্থিতি বা লয় হচ্ছে, জীব-জগৎ যদি তাঁরই লীলার প্রকাশ, তবে মহান ঈশ্বরের প্রয়োজনই বা কি তাঁরই সৃষ্ট জীবের মূর্তি ধরে জগৎ ত্রাণের জন্য আবির্ভূত হবার? অসীম ঈশ্বর তো সসীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেনই। যদি বলা হয় 'অবতার' হওয়াটাও ভগবানের লীলার অন্তর্গত তবে যারা এ কথা বলে সেই ধর্মবেত্তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অবতার সম্পর্কে উদ্ভট, অসংলগ্ন ও বিসদৃশ কল্পনা-গুলিও কি তাঁর লীলা-বিলাস?

২

হিন্দুর পুরাণ গ্রন্থে বিশেষভাবে দশাবতারের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে নয়টি অবতার—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং দশম অবতার কল্কি কলির শেষে অবতীর্ণ হবেন এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থে সর্বক্ষেত্রে দশাবতার একই দশনামে উল্লিখিত নেই। কৃষ্ণ ও বলরামের নাম নিয়ে এই পার্থক্য রয়েছে। দুই একটি পুরাণে কৃষ্ণের পরিবর্তে বলরামের নামোল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ পুরাণে যে দশাবতারের উল্লেখ আছে তারা হলেন :—

(১) মৎস্যাবতার (২) কূর্মাবতার (৩) বরাহবতার (৪) নরসিংহাবতার (৫) বামনাবতার (৬) পরশুরামাবতার (৭) রামাবতার (৮) কৃষ্ণাবতার (৯) বুদ্ধাবতার ও (১০) কল্কি অবতার। কল্কি পুরাণে লেখা হয়েছে ঈশ্বর কৃষ্ণাবতারের সঙ্গে বলরামাবতার রূপেও একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্যত্র উল্লেখিত আছে :—

"মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশস্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধদেব ও কল্কি ভগবানের দশ অবতার।

বাংলার ভক্ত কবি জয়দেব নীচের শ্লোক দুটিতে দশাবতার প্রশস্তি করেছেন :—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্নিবহতে ভূগোল মুদ্‌বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কালয়তে কারুণ্য মাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।"

ভাবানুবাদ : হে ভগবান বিষ্ণু। আপনি প্রলয়কালে মীনরূপে বেদোদ্ধারকারী, কূর্মরূপে সর্বলোক বহন কারী, বরাহরূপে পৃথিবীকে উত্তোলন কারী, নরসিংহ রূপে মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিদারণকারী, বামন রূপে কলিকে ছলনাকারী, পরশুরাম রূপে ক্ষত্রকুল ধ্বংসকারী, রাম-রাবণ-কে বিনাশকারী ; হলধররূপে মৃত্যুনাশকারী, বুদ্ধরূপে কল্যাণ দানকারী, ও কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণকে মূর্চ্ছিতকারী এই দশাবতার রূপ ধারণ করে মর্ত্যলোকে অবতরণকারী আপনাকে সভক্তি প্রণাম করি।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষ্ণের পরিবর্তে হলধর বলরামকে অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে ; তবে বাসুদেব কৃষ্ণ যে অন্যতম অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে কথাই অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থে ও মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। গীতা গ্রন্থে কৃষ্ণাবতারেরই মহাবাণী বিধৃত ও কৃষ্ণের বিভূতিরই প্রকাশ হয়েছে। পুরাণ মতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন এই পাঁচ অবতার হলেন পূর্ণাবতার। অপর পাঁচ অবতার বিষ্ণুর অংশাবতার রূপে আখ্যাত হয়েছেন। কল্কিপুরাণে নরপতিগণের কল্কি-স্তুতির মধ্যে অবতারগণ কোনো কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে :—

"হে কল্কিদেব। আপনার জয় হোক। আপনি নিজের মায়া প্রভাবে জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করেছেন এবং আপনার মায়া বলেই তার পরিণতি হচ্ছে।

আপনি ত্রিভুবনের উপকরণ সমূহ জলপ্লাবিত হয়েছে দেখে ও পৃথিবীতে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে না শুনে, পক্ষী ও জনপ্রাণীহীন নির্জন স্থানে মহাসলিলে মীনরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিজকৃত ধর্মরূপ সেতু-রক্ষার জন্য-ই আপনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন।

পূর্বকালে যখন দেব-দানব মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থনের জন্য মন্দর পর্বত স্থাপন করার স্থান না পেয়ে ব্যাকুল চিত্ত হয়েছিলেন তখন আপনি তাঁদের সাহায্য করার জন্য কৃত সঙ্কল্প হয়ে কূর্মাবতার রূপে পৃষ্ঠে মন্দর পর্বতকে ধারণ করেছিলেন। দেবতাদের অমৃত পান করানোর জন্যই

আপনাকে কূর্ম মূর্তি ধারণ করতে হয়েছিল।

যখন দানব সেনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করতে লাগল এবং ত্রিভুবন জয়ী পরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ দেবরাজকে সংহার করতে উদ্যত হলো, তখন তার বিনাশ ও পৃথিবীর উদ্ধার সাধন সঙ্কল্প করে আপনি মহাবরাহ অবতার হয়েছিলেন।

যখন মহাবল পরাক্রমী ত্রিভুবন বিজয়ী হিরণ্যকশিপু প্রধান প্রধান দেবতাদের নির্যাতন করেছিল, দেবতারাও যখন তার পীড়নের ভয়ে অতীব ভীত হয়ে উঠেছিল, তখন আপনি তাদের মঙ্গলের জন্য হিরণ্যকশিপুকে সংহার করতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু দৈত্য পতি ব্রহ্মার বরে অবধ্য জেনে আপনি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন। দৈত্যরাজ আপনাকে দেখে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলে আপনি নখরাঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ করে তাকে সংহার করেন।

তারপর আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বলি রাজার যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজরূপে জন্ম গ্রহণ করে বামন মূর্তি ধারণ করে দৈত্যরাজকে মোহিত করার জন্য ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করেন। পরে উৎসর্গ বারি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আপনি বিরাট মূর্তি ধারণ করেন। তার পরে আপনি বলিকে পাতালে প্রেরণ করে ত্রিলোকদানের ফল স্বরূপ তার দৌবারিক হয়ে থাকেন।

এরপর অতুল পরাক্রমশালী হৈহয় বংশীয় রাজা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় নৃপতিকুল অহংকারে মত্ত হয়ে ধর্ম অতিক্রম করে অত্যাচারী হয়ে উঠলে আপনি পরশুরাম অবতার রূপে একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন।

তারপর পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন শঙ্কিত হয়ে উঠলে তাকে দমন করার জন্য আপনি সূর্য-বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য আপনি পত্নীসহ যখন বনে গমন করেন তখন রাবণ সীতাকে হরণ করে। ফলে আপনি ক্রোধ পরবশ হয়ে বানর

সেনা সংগ্রহ করে সাগর অতিক্রম করে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করে-ছিলেন।

পরবর্তীকালে আপনি পুনরায় বসুদেব তনয় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্য-দানব দলন করে ত্রিলোক থেকে দুষ্কৃত দূর করেছিলেন। সে সময় আপনি বলরামরূপেও অবতীর্ণ হন।

তারপর আপনিই বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে নানাপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন করে সংসার ত্যাগ করেন এবং মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ পরিহার করবার উপদেশ দেবার জন্য বুদ্ধাবতার রূপে প্রসিদ্ধ হন।

এখন আপনি কলিকুল ধ্বংসের জন্য এবং বৌদ্ধ, পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির শাসনের জন্য কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিক ধর্ম রক্ষা করবেন।"

উপরের বক্তব্যের মধ্যে সত্য উপলব্ধির সঙ্গে যে কতখানি কাল্পনিক ও অসার কথা রয়েছে তা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করা হবে।

অবতার বৃত্তান্ত সবই আমাদের পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণাদিগ্রন্থে বহু অস্বাভাবিক কল্পনার সঙ্গে যুগপরম্পরার ইতিহাস, ভূগোল ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব নানা ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। রূপকের আড়ালে হয়তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও দার্শনিক ভাবনা রয়ে গেছে। তাছাড়া সম্ভবতঃ পুরাণগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিভিন্ন সাকার রূপকল্পনা করে বিশেষ ধর্মীয় মতের প্রচারদ্বারা সাধারণ মানুষকে সেই সকল দেবরূপের প্রতি আকৃষ্ট করা কিন্তু বোঝানো যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বৈশিষ্ট্য থাকলেও সবই এক মহান ঈশ্বরের নানা রূপাভিব্যক্তি তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব এবং তিনিই ব্রহ্মা। সাধারণ মানুষ সহজে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না। বিভিন্ন মানসিকতা অনুযায়ী ঈশ্বরের এক এক বিশেষ কল্পিত রূপের প্রতি তারা আকর্ষিত হয়। কিন্তু কাল পরম্পরায় পুরাণগুলিতে এই সত্য প্রকটিত না হয়ে বিশেষ বিশেষ দেবতা-কেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং জগৎ পালক জগৎ রক্ষক ও জগৎ নিয়ন্তা হিসাবে মহান দেবতা বিষ্ণুই বার বার জগৎ

রক্ষণ ও জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হন এরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই অবতার কাহিনীর অধিকাংশই কল্পিত বা অতিরঞ্জিত। কোনো কোনো কাহিনীর বিষয় একেবারে স্বার্থপূর্ণ ও বিপরীত ধর্মী।

কথিত আছে যে মহর্ষি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা বা সঙ্কলক। কথাটি সম্ভবত ঠিক নয়। একাকী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির পক্ষে যুগান্তর কাল-ব্যাপি মহাভারতাদি রচনার সঙ্গে এই সুবিশাল কর্মসম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। মনে হয় যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রচনাকার বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ লিখেছেন এবং তাঁরা সকলেই ব্যাস নামে আখ্যাত হয়েছেন। একাধিক পুরাণে একই ঘটনা একটু হেরফের করে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা পুরাণ-গুলির সংখ্যা ও কলেবর যে যুগে যুগে বৃদ্ধি পেয়েছে সে অনুমান করা চলে। যে সব তত্ত্বের বা আচার বিচারের তেমন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না (কেবল সমাজপতি ও ধর্মযাজক ব্রাহ্মণদেব স্বার্থপূর্তির উদ্দেশ্য ছাড়া) এমন অনেক কথা সন্নিবেশ রয়েছে দেখা যায়। সে কারণে মূল-বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পুরাণগুলির অবাস্তব বিষয়গুলি বর্জন করতে হবে।

বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনার মতোই প্রথম পাঁচ অবতারের রূপকল্পনা করা হয়েছে মানুষের ধারণার দিগন্তকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে। তাঁর সৃষ্ট জগতকে ধ্বংস এবং দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্য অবতাররূপে ঈশ্বরের পক্ষে জগতে অবতীর্ণ হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। আবার অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত পৃথিবীর বিপদ মুক্তির ব্যাপারে কাণ্ডারী হিসাবে ঈশ্বরের অবতার কল্পনাও অমূলক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরম শক্তিমান ঈশ্বর তো যেভাবেই হোক তা করতে পারেন, সে জন্য তাঁর অবতার রূপ গ্রহণ করার দরকার কি ?

সম্ভবতঃ অবতার কাহিনীগুলির মধ্যে ইতিহাসের সত্য ঘটনা নিহিত রয়েছে ; এগুলির মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক বিপর্যয়ের ছবি, আর্য ও অনার্যদের কলহের পরিচয় এবং সর্বোপরি বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা—ভালবাসা—নির্ভরতা। লক্ষ্য করার বিষয় যে দশ

অবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচ অবতার মনুষ্যাকৃতি নন (বামনাবতারকে ঠিক মনুষ্যাকার বিশিষ্ট অবতার বলা যায় না)। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত এই পাঁচ অবতার পুরাণ-বর্ণিত চার যুগে জগৎ ত্রাণের জন্য মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যযুগে আবির্ভূত হয়েছেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন দেব। আশ্চর্য ! একই যুগে পর পর পাঁচজন অবতারের অবতারণ ! সত্যযুগ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় ঐ সময় ধর্ম, ন্যায়-নীতি, ইত্যাদির ব্যাপারে সব কিছু সুশৃঙ্খল ভাবে পালিত হতো—কোনো অনাচার অবিচার ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঐ সত্যযুগেই অধর্ম, অন্যায় ও অত্যাচার দমন করতে ঈশ্বরকে পাঁচবার অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

তারপর ত্রেতা যুগে জামদগ্ন্য পরশুরাম ও দাশরথি রামচন্দ্র অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন। দ্বাপর যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। তারপর কলি যুগে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হলেও প্রকৃত কলির অবতার নাকি কল্কিদেব যিনি এখনও আবির্ভূত হন নি। কল্পনা করা হয়েছে কল্কিদেব কলির শেষে আবির্ভূত হয়ে জগতের অধর্ম নাশ করবেন এবং জগৎ ধ্বংস হয়ে আবার সত্যযুগের নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

দশাবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচ অবতার মনুষ্যরূপী নন কিন্তু পরের পাঁচজন মানুষ ! তার মধ্যে চারজন ইতিহাসের মানুষ—ঐতিহাসিক পুরুষ। এঁরা হলেন পরশুরাম, রামচন্দ্র. কৃষ্ণ, বলরাম ও বুদ্ধদেব। দশম অবতার কল্কি মনুষ্যরূপী অবতার হিসাবে কল্পিত হলেও তিনি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে জন্মে তাঁর কর্ম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে জগতের অধর্ম দূর করে সত্যযুগকে আবার ফিরিয়ে আনবেন এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আপনার সৃষ্টি জগতকে রক্ষা করা, জগতের স্থিতি-শীলতা বজায় রাখা, দৈত্য বা অসুরদের অত্যাচারের কবল থেকে স্বর্গে দেবতা ও মর্ত্যে মানবদের ত্রাণ করার জন্য দুষ্ট অসুর বা দানবদের সংহার করা এবং জগতে শান্তি সুখ ফিরিয়ে আনা—এই সকল উদ্দেশ্য সফল

করার জন্যই বামনাবতার পর্যন্ত বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের রূপ কল্পনা করা হয়েছে বলেই ধারণা হয়। সে সব বৃত্তান্তই পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় ঘটনাগুলির দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে ঐ সব বিপদ আপদগুলিই হয়তো পূর্বকালে আর্যদের অস্তিত্ব রক্ষায় পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল এবং সে সব বাধা পরে তারা সংগ্রাম করে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলি হয়তো কল্পনার রং মেখে কালে কালে অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ অনুমান যদি সত্যই হয় তবু একথা যথার্থ যে জগতে যা কিছু ঘটে তা সবই পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে।

পুরাণ গ্রন্থগুলি পাঠে জানা যায় যে ঈশ্বরের অবতারগণ বিশেষভাবে জগতের প্রাণীকুলের ত্রাণের জন্য এবং জগতের স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু প্রথম দিকের অবতারগণ কেবল দস্যু সংহার ও দানব দলনই করেছেন। তাঁদের শ্রীমুখ থেকে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের পালয়িতব্য ধর্মীয় আচরণবিধি ও বিভিন্ন ব্রত-পালন পদ্ধতি। এসব তাঁরা বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন। এগুলি কিন্তু পুরাণকারেরই বক্তব্য—তাদের কল্পনা-কুসুমের মালিকা।

পুরাণগুলি পাঠ করলে মনে আরও একটি প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়। এখানে উল্লিখিত যাবতীয় ঘটনা বা বিষয় কেবল ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে ঘটেছে—জগৎ বলতে যেন ভারতকেই বোঝাচ্ছে। পুরাণকারের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া এর আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হিন্দু ধর্মের কথাই বলবে কিন্তু ঈশ্বর তো আর কেবল ভারতবর্ষ বা হিন্দুধর্মের নয়। আবার বহু স্থানে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথাও বলা হয়েছে। বাস্তবিক পুরাণের কথা বুঝতে পারা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অবতারগণ যে যে যুগে পৃথিবীতে (ভারতবর্ষে) অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অসভ্য ছিল না, কিন্তু সে সব দেশে অনাচারী বা অত্যাচারীর প্রাদুর্ভাব হলেও তাদের ধর্মের ইতিহাসে বা শাস্ত্র গ্রন্থে হিন্দুর অবতারের মতো কোনো অবতারদের

কথা শোনা যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দু ধর্মেই এই অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পৌরাণিক যুগে এর সূত্রপাত না হলেও বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হয়। জগতের মঙ্গলের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য, ঈশ্বরের লীলাকে পুষ্ট করার জন্য তাঁরই ইচ্ছায় জীবের মধ্যে ঈশ্বরীয় বিভূতির যে প্রকাশ ঘটেছে সম্ভবত তাকেই 'অবতার' রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

৩

অবতার-তত্ত্বে মৎস্যাবতারই মহাবিষ্ণুর প্রথম অবতার। মৎস্যপুরাণে মৎস্যাবতার সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা আছে। পূর্বকালে মহাপ্রলয়ের ফলে যখন পৃথিবী-জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল তখন সেই অসীম জলরাশির মধ্যে জগতপতি বিষ্ণু জীবরক্ষা ও বেদরক্ষার জন্য মীন রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মৎস্যাবতার সেই অগাধ সলিলে বিচরণ করে সৃষ্টির বীজ নৌকায় রেখে সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন। পুরাণের বর্ণনানুযায়ী সত্যযুগে রবিনন্দন মনুর রাজত্বকালে বিশ্বে মহাপ্লাবন হয়েছিল। জগন্নিবাস বিষ্ণু ঐ মহাপ্রলয়ের সময় মীনরূপ গ্রহণ করে মনু রাজাকে যথা কর্তব্য করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বড়বিচিত্র মৎস্য পুরাণের কল্প-কাহিনী। বলা হয় যে স্বয়ং গদাধর কথিত এই পুরাণ। মূল কাহিনী বিন্যাসিত হয়েছে এই ভাবে :—

পুরাকালে রবিনন্দন রাজা মনু পুত্রের হাতে রাজ্য ভার সমর্পণ করে মলয় পর্বতে কঠোর তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। তিনি সুখে দুঃখে সমদর্শী ছিলেন। ক্রমে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি একজন আত্মজ্ঞ পুরুষ ও পরমযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর দীর্ঘকালের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বললেন, "পিতামহ! আমি আপনার কাছ থেকে কেবলমাত্র এই বর চাই যে পৃথিবীতে প্রলয়কাল উপস্থিত হলে আমি যেন বিশ্ব চরাচরের সমস্ত জীবকে রক্ষা করতে পারি।"

ব্রহ্মা বললেন, "তথাস্তু, তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে।" তারপর তিনি অন্তর্হিত হলেন। পরমযোগীপুরুষ মনু আপনার যোগসিদ্ধির ফলে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটবে।

তারপর বহুবছর কেটে গেল। একদিন মনু তাঁর আশ্রমে বসে পিতৃতর্পণ করছেন এমন সময় এক জলাদ্র শফরী (পুঁটি মাছ) হঠাৎ তাঁর করতলে এসে পড়ল। রাজর্ষি মনু বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি করুণা-বশে শফরীকে তাঁর কমণ্ডলুর মধ্যে রেখে দিলেন। কি আশ্চর্য! এক রাত্রের মধ্যেই ষোল আঙুল পরিমিত লম্বা হয়ে উঠল শফরী এবং মৎস্য রূপেই মনুকে বলল, "প্রিয় রাজা! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন।"

মনু তখন তাকে কমণ্ডলু থেকে তুলে নিয়ে একটি মণিকের অর্থাৎ মাটির কলসীর মধ্যে রেখে দিলেন। মাছটি রাজাকে অবাক করে এক রাতের ভিতরেই তিরতিরিয়ে তিন হাত পরিমাণ লম্বা হয়ে উঠল। সে আর্তস্বরে বলতে লাগল, "রাজা! এই মণিকের মধ্যে থেকে আমি হাঁফিয়ে উঠছি, আমাকে রক্ষা করুন—আমাকে রক্ষা করুন।"

বিস্মিত মনু তখন মৎস্যকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেখানেও যখন তার স্থান সঙ্কুলান হলো না, তখন তিনি তাকে এক সরোবরের জলে ছেড়ে দিলেন। সরোবরে নিক্ষিপ্ত হয়ে মাছ এক বিশাল দেহ ধারণ করল। যোজন পরিমিত হয়ে উঠল তার দেহ-দৈর্ঘ্য। সে সরসী-সলিলে চলতে ফিরতে পারল না, অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, "রাজা! এখানে থাকতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমায় এখান থেকে উদ্ধার করুন। আমাকে উদ্ধার করুন।"

এবার পৃথ্বীশ মনু মাছটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেখানেও সে বেড়ে উঠে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করল। তখন রাজা তাকে গঙ্গা থেকে তুলে সাগরে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যময় মাছ তার দেহ বিস্তৃত করে বিশাল সমুদ্র পরিব্যাপ্ত করে ফেলল। মৎস্যের অলৌকিক কর্ম দেখে রাজর্ষি মনু ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তুমি কে, আমায় সত্য করে বল? তুমি কি কোনো মায়াবী দৈত্যপতি? নাকি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর বিষ্ণু? এ দুজন ছাড়া কেউ তো এমন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না?"

বিশাল মৎস্য কোনো উত্তর না দেওয়ায় মনু আবার বললেন, "আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়ত পরমেশ্বর হরি, ধরাধামে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। প্রভু! আমায় এ কথা সত্য করে বল। মনে আর ক্লেশ দিও না! হে হৃষীকেশ! হে জগন্নাথ! তোমাকে প্রণাম।"

মনুর কথা শেষ হলে সমুদ্র আলোড়ন করে মৎস্যরূপী জর্নাদন বললেন, "প্রিয় মনু! তুমি যথার্থ অনুমান করেছ। শোন, এই পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, কূপ-সরোবর ও নদী-সমুদ্র ঘেরা পৃথিবী অচিরকাল মধ্যে মহা-প্লাবনে জলমগ্ন হবে। আমি জীবকুল রক্ষার জন্য দেবতাদের দ্বারা এক তরণী নির্মাণ করিয়েছি। রাজা! তোমাকে এই তরণী-মধ্যে যাবতীয় স্বেদজ, উদ্ভিজ ও জরায়ুজ জীবদের রেখে তাদের মহাপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যখন তরণী মহাঝঞ্ঝায় আন্দোলিত হবে তখন আমার শৃঙ্গে তাকে বেঁধে রাখবে। তারপর যখন বিশ্বচরাচর ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তুমিই হবে সমস্ত জগতের প্রজাপতি। এইভাবে কৃতযুগের (সত্য যুগের) প্রারম্ভে তুমিই সর্বজ্ঞ রতিসম্পন্ন মন্বন্তরাধিপতি হয়ে সম্মান লাভ করবে।

বিনয়পূর্ণ স্বরে মনু জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু! কত বছর পর জগতে প্রলয় ঘটবে? তখন জীবগণকে কেমন করে আমি রক্ষা করব? আপনার সঙ্গে আবার আমি কবে মিলিত হব?"

মৎস্যরূপী মধুসূদন বললেন, "আজ থেকে পৃথিবীতে শত বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হবে। তার ফলে অচিরেই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তাতে জগতের একান্ত অশুভ উৎপন্ন হবে। তারপর সূর্য প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ করলে জীবকুল বিনাশ হবে। যুগক্ষয়ের উপক্রমে বাড়বানল বিকৃত হবে। পাতাল থেকে উদ্ভূত হবে সর্পকুলের মুখোদ্গীর্ণ বিষাগ্নি। শিবের ললাট-নয়নের অনল শিখা নির্গত হয়ে ত্রিজগৎ দগ্ধ করতে থাকবে।"

তারপর ক্ষণকাল বিরত থাকার পর মৎস্যরূপী বিষ্ণু আবার বললেন, "এই ভাবে যখন সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হবে তখন সেই অনলের উত্তাপে আকাশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। তারপর দেবমণ্ডল ও নক্ষত্র

মণ্ডলসহ সমস্ত বিশ্ব চরাচর উপনীত হবে সংহার দশায়। সেই সঙ্গে উৎপত্তি হবে সম্বর্ত, ভীমনাদ, দ্রোণ, চণ্ড, বলাহক, বিদ্যুৎপাত ও কোণ নামক সাতটি মেঘের প্রলয়। তারা অগ্নিদগ্ধ বসুন্ধরাকে অজস্র বারি ধারায় প্লাবিত করবে। সমস্ত জলধি মিলে মিশে গিয়ে জলপ্রাবল্যে একার্ণবে পরিণত হবে। হে রবিনন্দন মনু! ঐ সময়ে তুমি আমার প্রদত্ত রজ্জু দিয়ে বেদ-তরণীতে সৃষ্টির বীজ রেখে আমার শৃঙ্গে বাঁধন দেবে। দেবগণ দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার প্রাসাদে তুমি সুরক্ষিত থাকবে। যুগান্তে আমি, ব্রহ্মা, সূর্য, সোম, চতুর্লোক, পুণ্যময়ী নদী নর্মদা, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, ভগবন ভব, দেবগণ ও বিদ্যাসমূহ পরিবৃত হয়ে সমস্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার সঙ্গে অবস্থান করবে। এইভাবে চাক্ষুষ মনুর অবসানে জগৎ যখন একার্ণবীকৃত হবে তখন, হে পৃথ্বীশ মনু, আমি আবার বেদসমূহ প্রবর্তিত করব।" মৎস্যরূপী ভগবান পৃথিবীপতি মনুকে এই কথা বলে তক্ষুনি অন্তর্হিত হলেন। মনুও তখন পুনরায় যোগমগ্ন হলেন এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তিনি যোগাভ্যাসেই নিমগ্ন রইলেন।

তারপর বহু বর্ষ গত হলে সেই মহালগ্ন এলো। শৃঙ্গবান মৎস্যরূপ ধরে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। মহাভুজঙ্গ রজরূপ ধারণ করে মনুর পাশে উপস্থিত হলো। তখন ধর্মজ্ঞ মনু যোগবলে ভুজঙ্গরজ্জু সহযোগে নিখিল ভূত সমুদয়কে আকর্ষণ করে মহানৌকায় স্থাপন করলেন এবং মৎস্য-শৃঙ্গের সঙ্গে তাকে বন্ধন করলেন। তারপর নৌকায় আরোহণ করে তিনি মৎস্য-রূপী অবতারকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

এইভাবে সৃষ্টি পালক বিষ্ণু মনুকে দিয়ে মহাপ্লাবনের সময় ধ্বংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন। মনু সেদিন মৎস্যাবতারের শ্রীমুখ থেকে জগতের সৃষ্টি বিষয়ে ও তার রক্ষণ ব্যাপারে যে সমস্ত কথা শুনেছিলেন সে সবই মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বলা হয় যে স্বয়ং মৎস্যরূপী গদাধরের শ্রীমুখ নিসৃত এই মৎস্যপুরাণ যা পরবর্তীকালে সূতমুনি সংসারে প্রচার করেছিলেন।

পুরাণের এই উল্লেখের সত্যাসত্য বিচারের জন্য কালহরণের প্রয়োজন

নেই ; কাহিনী কল্পিত কি রূপকাশ্রিত সে সব বিচার না করেও মনে করা যেতে পারে যে ঈশ্বর প্রেমিক ঋষিরা তাঁদের ধ্যান ও মননের দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষকে সেই সত্য বোধে উদ্বুদ্ধ করতেই প্রেম, ভক্তি ও নিষ্ঠা জাগাবার চেষ্টা করে ঈশ্বরের গুণাবলী ও শক্তির কথা কল্পিত বা রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন অথবা এ সমস্ত ব্যাপারটাই ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অবাস্তব কল্পনা।

মৎস্যপুরাণ পাঠে জানা যায় যে ভগবান অবতার রূপ গ্রহণ করে পৃথিবী-পতি মনুর নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। একটি প্রশ্নে মনু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু ! জগতের উৎপত্তি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানু-চরিত, ভুবনবিস্তার, নিত্যশ্রাদ্ধ কল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত, দেব প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য আরও জাগতিক বিষয় বিশেষ করে বিস্তৃতরূপে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলুন।" উত্তরে মৎস্যাবতার বলেন, "প্রিয় রাজা। মহাপ্রলয়ের অবসানে অনাদি অতীতে বিশ্বচরাচর তমোময় ছিল। সমস্তই যেন প্রসুপ্ত বা নিষ্প্রাণ ছিল। জগৎ অবিজ্ঞেয় ও অবিজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। তারপর অব্যক্ত মূর্তি স্বয়ম্ভূ নিখিল জগৎ প্রকটিত করে তমোরাশি অপসরণ করে আবির্ভূত হলেন। যিনি সনাতন, ইন্দ্রিয়াতীত, অব্যক্ত, অনীয়ান, মহীয়ান, তিনিই তখন নারায়ণ নামে বিখ্যাত হয়ে সমুৎপন্ন হন। তারপর আপন ভাবনাকে রূপায়িত করার মানসে বিশ্ব সৃষ্টি কামনায় তাঁর নিজ অঙ্গ থেকে সর্বাগ্রে তিনি সৃষ্টি করলেন সলিল রাশি। তারপর সেই অগাধ জলে বীজ নিক্ষেপ করলেন। ঐ বীজ কালক্রমে পরিণত হলো এক হেম-রৌপ্যময় মহান অণ্ডে এবং অযুত মার্তণ্ডের মতো প্রভাময় হয়ে উঠলো। তেজময় আত্মভূ স্বয়ং অণ্ড মধ্যে প্রবেশ করে সহস্র বৎসর বাস করেন এবং পরে প্রভাব ও ব্যাপ্তি-ক্রমে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হন। তার মধ্যে প্রথমেই সূর্যদেব প্রাদুর্ভূত হলেন। তিনি আদিভূত বলে আদিত্য নাম ধারণ করলেন। তারপর ব্রহ্মা ব্রহ্ম পাঠ করতে করতে আবির্ভূত হলেন। সেই অণ্ডের দুই খণ্ডে স্বর্গ ও

ভূমিতল নির্মিত হলো। তারপর ব্রহ্মা দিগ্‌মণ্ডল ও ব্যোমভাগ সৃষ্টি করলেন। ক্রমে অণ্ডটি মেরু, শৈলমালা, মেঘ ও তরিৎমালা, নদীসমূহ, পিতৃগণ এবং লবণ-ইক্ষু-সুরা সমন্বিত ও বিধির রত্ন সমৃদ্ধ সপ্তসাগর উদ্ভূত হলো।

এইভাবে পরম বিভু জনার্দন সৃষ্টি-বিস্তার বাসনায় প্রজাপতি রূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর তেজ হতে উৎপন্ন হলেন মার্তণ্ড। অণ্ড মৃত হয়ে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় মার্তণ্ড।

বিশ্বনিয়ন্তা বিষ্ণুর যে রজোগুণময় রূপ, তাই-ই লোক পিতামহ ব্রহ্মার চতুর্মুখ মূর্তি। যিনি এই সুরাসুর ও নর পরিবৃত বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁকে রজোমূর্তি বলে জানবে এবং তিনিই মহাসত্ব বলে প্রখ্যাত।

এইভাবে মৎস্যাবতার পৃথ্বীশ মনুকে জগৎ-সৃষ্টির ইতিবৃত্ত শোনালেন। তারপর মনুর প্রশ্নের উত্তরে একে একে তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মার চতুর্মুখ লাভের ঘটনা ও তাঁর দ্বারা লোক সকল সৃজনের কথা বর্ণনা করলেন। তারপর অবতাররূপী বিষ্ণু মনুকে একে একে সৃষ্টি বিবরণ ও মানুষের বিভিন্ন কৃতকর্মের কথা বললেন। জগৎব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস ও ভূগোল বর্ণণা করলেন। ব্রত মাহাত্ম্য ও দান মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় কথা বললেন। কি কি পুণ্য কর্ম করলে সৃষ্টি রক্ষা হয় সে কথাও জানালেন। জগতের কল্যাণের জন্য, সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং নিজের মঙ্গলের জন্য মানুষের কি কি কাজ করা কর্তব্য সে কথা জানিয়ে দিলেন। মৎস্য-পুরাণের সূত মুনি এসব বর্ণনা করেছেন।

ভগবানের মৎস্যাবতার হওয়া সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে নীচের বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান জগন্নিবাস ভগবানের পক্ষে যে সমস্ত বিষয় আমাদের চিন্তার মধ্যে রয়েছে সেগুলি অথবা যে সমস্ত বস্তু আমাদের ধারণার অগোচরে রয়েছে সেগুলিও যা কিছুই হোক না কেন সবই করা সম্ভব। কারণ জগতে যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কিন্তু তিনি মৎস্যরূপই বা ধরলেন কেন অথবা মৎস্যা-

বতার রূপেই জগৎ পালক বিষ্ণু, প্রথম অবতাররূপে কল্পিত হলেন কেন ? কল্পনার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে জলমগ্ন ধরিত্রীর অগাধ সলিলে সহজভাবে বিচরণ করতে পারে মৎস্য। তাঁরই সৃষ্ট জগতে তিনি প্রলয় এনেছেন সৃষ্টিকে নবভাবে রূপায়িত করার অভিলাষে। এ তাঁর লীলা রঙ্গ। ঈশ্বর সৃষ্টি রক্ষা করলেন সৃষ্টির বীজকে মহা-নৌকায় তুলে রেখে। তাঁর মীনরূপে অবতারত্ব কেবল সৃষ্টিকে রক্ষা করা ও তাকে নবরূপ দান করার উদ্দেশ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। পৃথিবী সেদিন অত্যাচারীর অত্যাচারে উৎপীড়িতা হয়েছিল কিনা অথবা আর্তজীবের ক্রন্দন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছেছিল কিনা পুরাণে সে উল্লেখ নেই।

জগতপ্রভুর মৎস্যরূপ গ্রহণ করার কি কোনো প্রয়োজন ছিল ? তিনি যখন ইচ্ছা করলে সব কিছু হতে পারেন, সব কিছুই করতে পারেন—তাঁর ইচ্ছাতেই যখন জগতের সমস্ত ঘটনা ঘটবে তখন তাঁর প্রয়োজন তিনিই জানবেন। তবে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যিনি অনন্ত ঈশ্বর, অসীম ঈশ্বর কেন তিনি সসীম রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন ?

বস্তু বিজ্ঞানী মন্তব্য করতে পারে যে ঈশ্বরের মৎস্য রূপ গ্রহণ করার ব্যাপার মানুষের নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়—তাঁর সর্বশক্তিমানতা প্রতিপন্ন করার স্থূল চেষ্টা ও ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের মনকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করার প্রয়াস মাত্র। কিন্তু বস্তু বিজ্ঞান যদিও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেনি তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকারও করেনি।

মৎস্যপুরাণের বর্ণিত ঘটনাবলী মনোযোগসহ পাঠ করলে বোঝা যায় যে এগুলি পুরাণকারের নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল ছাড়া আর কিছু নয়। আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এসব আর কিছু নয়। আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে এসব তার স্ব-কল্পিত বা উপলব্ধ তত্ত্ব। সে যুগে ধর্মসম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হয়তো পুরাণকারেরা ধর্মগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে মৎস্যাবতার বৃত্তান্ত শুধুমাত্র কল্পনা তাহলেও এ

কল্পনার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে। কি সে কারণ হতে পারে? জড় বিজ্ঞান অঙ্ক কষে অভিমত ব্যক্ত করেছে যে সৃষ্টির পর পৃথিবী সলিল রাশিতেই পূর্ণ হয়েছিল। পরে ক্রমে ক্রমে স্থল ভাগের সূচনা ও প্রসার ঘটে (তবু এখনও পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল) এবং আদি প্রাণের চিহ্ন নিয়ে জন্মায় শ্যাওলা, পরে জলচর মীন। জড় বিজ্ঞান এ তথ্য প্রমাণ করেছে। তাছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে এবং চীন ও ইহুদি জাতির ইতিহাসেও উল্লেখ আছে যে প্রাচীনকালে এক বিরাট প্লাবন ঘটেছিল। সে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাল আনুমানিক ৮০৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ঐ সময়কে সত্যযুগ বলা হয়েছে। ঐ মহাপ্লাবনের ফলে আর্য জাতি (হিমালয়ের উত্তর দিকের অধিবাসী) ছিন্নভিন্ন হয়েছে। যারা কোনোক্রমে রক্ষা পেয়েছিল তারা নৌকায় বা অন্য কোনো উপায়ে ছিটকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আর্য জাতির বিস্তার তখন থেকেই শুরু হয়। পৃথিবীর পশ্চিম ভূভাগে অর্থাৎ ইউরোপ এবং হিমালয় থেকে এলবার্জ পর্বতের দক্ষিণ বিভাগ পর্যন্ত ছিল আর্য জাতির বিস্তার-সীমা। আনুমানিক ৫০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত আর্য জাতির এক বিরাট শাখা দলে দলে এসে পঞ্জাব থেকে পারস্য সাগর পর্যন্ত স্থান জুড়ে দলে দলে বাস করতে থাকে। ভারতীয় আর্যগণ তখন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ অনেকাংশে তাদের সঙ্গে মিশে যায় ও সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। পুরাণে এদেরই বলা হয়েছে ভারত সন্তান।

অতীতের মহাপ্লাবনের ঘটনাকেই কি পুরাণ মৎস্যাবতার কাহিনীর মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছে? পাশ্চাত্যদেশেও এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। প্রবল জলপ্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেলে একটি নৌকায় প্রত্যেক জীবের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীকে তুলে সে সময় সৃষ্টি রক্ষা হয়েছিল এইরূপ কথিত আছে।

সৃষ্টি রক্ষা করা ও তার স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য জনমনে অবতার সম্পর্কে যে ধারণা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে ভগবান বিষ্ণুরই

মুখ্য ভূমিকা। তাই তিনি জগৎ পালক ও জগৎ রক্ষক। তাই বারবার তাঁর অবতার রূপ কল্পনা করা হয়েছে। হয়তো সাধারণ মানুষের মনে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য জাগ্রত করে রাখার জন্য অথবা মানুষকে বিষ্ণু বা শ্রীহরি বা নারায়ণের সেবক করার জন্যই এই সকল কল্পনার দ্বারা প্রয়াস চালানো হয়েছে। যেহেতু প্রাচীন ইতিহাস ভূগোল ও দর্শনের ক্ষেত্রে অবতার কাহিনীগুলির অনেক বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, তাই এগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও এবং স্বার্থচরিতার্থতার জন্য নিছক প্রচার হিসাবে গণ্য করা হলেও বাস্তবিক এর এক ফলসিদ্ধি ঘটেছে।

ঈশ্বরভক্ত মানুষের কাছে জগতের উদ্ধারের জন্য জগতপতি ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া যেমন স্বাভাবিক বিশ্বাসের ব্যাপার; তেমনি এ সম্পর্কে অবিশ্বাসী নাস্তিকের যুক্তি তর্ককেও দূরে ঠেলা যায় না। আস্তিকের ঈশ্বর ও নাস্তিক বা জড় বিজ্ঞানীর মূলীভূত জাগতিক মহাশক্তি একই। তিনি সর্বশক্তিমান ; তিনি নানা রূপে, নানা নামে প্রকাশমান—তিনি স্বয়ম্ভূ।

পুরাণ পাঠে আমরা জেনেছি যে মৎস্যাবতারের সময় জগতে মহাপ্রলয় ঘটেছিল। জানা যায়নি তখন জগতে পাপরাশি পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল কিনা? জগৎ কতখানি গ্লানিময় হয়েছিল? তাহলে কি আপনার লীলার বশে জগৎ নিয়ন্তা ভূ-বিপর্যয় ঘটিয়ে ছিলেন? আবার তিনিই কি মৎস্যাবতার রূপে সৃষ্টির বীজ রক্ষা করেছিলেন? মৎস্যপুরাণের অপর যা কিছু মতের অবতারণা মানুষকে কি কোনো বিশেষ ধর্মমতে ওপথে চালনা করার কল্পিত প্রয়াস মাত্র?

৪

দশাবতার আবির্ভাবের দ্বিতীয় আবির্ভাব হলেন কূর্মাবতার। জড় ও জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে এই বিশ্ব চরাচর চৈতন্যময় ঈশ্বরের লীলাভূমি। তিনি জীবকুলের নিয়ন্তা, জগতে সর্ববস্তুতে তিনি ওতঃপ্রোত। তাই কূর্মরূপে তাঁর আবির্ভাব মানুষের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকলেও, ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব কি? যদি কূর্মাবতারকে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার হিসাবে কেবল কল্পনাই করা হয়ে থাকে, তবে এই কল্পনার ভিত্তি যে বিধাতার রহস্যময় কর্মকাণ্ডকে উপলব্ধির প্রয়াসের মধ্যে নিহিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পুরাণ গ্রন্থের অন্তর্গত অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরাণ হলো কূর্ম-পুরাণ। বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত কূর্মাবতারের কাহিনী এই পুরাণের মূল কথা। ভগবানের মৎস্যাবতার রূপ গ্রহণের পরই কূর্মাবতারের অভিব্যক্তি। কূর্ম-পুরাণের বর্ণিত কাহিনী সমস্তই কূর্মাবতাররূপী জনার্দনের মুখ নিসৃত বলে জানানো হয়েছে।

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিষ্ণু পৃথিবীতে কূর্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? এ সম্বন্ধে কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে যে পূর্বকালে দেবতারা দানবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থনে উদ্যোগী হয়। তখন কীলক স্বরূপ বুন্দেরাচলকে স্থাপনের উপযুক্ত স্থান না পাওয়ায় দেবগণ ব্যাকুল চিত্ত হলে জগৎ প্রভু বিষ্ণু কৃপা পরবশ হয়ে তাঁদের সাহায্য দানে কৃতসংকল্প হন এবং কূর্মরূপ ধারণ করে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দর পর্বতকে ধরে রাখেন। দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে অমর করার জন্যই তিনি কূর্মরূপ গ্রহণ করেন। সমুদ্র মন্থনে মহালক্ষ্মী উত্থিতা হয়েছিলেন, যিনি বিষ্ণুর ভার্যারূপে বরেণ্যা হন। ঐরাবত উত্থিত হলে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে গ্রহণ করেন, অমৃত-ভাণ্ড

উত্থিত হলে বিষ্ণু তাঁর মায়ায় দানবদের বিমুগ্ধ করে দেবতাদের জন্য সেই অমৃত-ভাণ্ড গোপনে সংগ্রহ করে তাঁদের অমৃত দানে মৃত্যু রহিত করেন। তারপর জলধি মন্থনে উঠে আসেন বৈদ্য শিরোমণি ধন্বন্তরি।

পৌরাণিক উপাখ্যানটির চালচিত্রে কল্পনার আলপনা আঁকা হলেও, এ তথ্য আমাদের জানা যে সাগরতল রত্নরাজির আগার—তাই সমুদ্রের এক নাম 'রত্নাকর'। সাগরতলের রত্নরাজি আহরণ করা হয় ডুবুরী মারফৎ। আদি-কালের সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান কি তেমন কোনো ইঙ্গিত বহন করে?

বিষ্ণুর কূর্মাবতার রূপ কল্পনার মধ্যে আরও একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায়। জগৎ-পালক বিষ্ণুর পক্ষে সৃষ্টি রক্ষার জন্য, জীব ও দেবতাদের ত্রাণের জন্য স্ব-মূর্তিতে বা তাঁরই অভিলষিত কোনো জানা বা অজানা জীবের মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে হয়তো কোনো বিরুদ্ধ ব্যাপার নেই যদিও বিষয়টি উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং বলা যায়, দেবদেবীকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক কল্প-কাহিনীর মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থও রয়েছে।

সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যানে বিষ্ণুর অভিব্যক্তি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। তাঁর কূর্মরূপ ধারণ করে দেব-দানবগণকে সাগর-মন্থনে সহায়তা করা, তাঁর মহালক্ষ্মীকে লাভ; পরিশেষে কূর্মপুরাণ বিষ্ণু মাহাত্ম্য কথন এবং জীব ও জগতের মঙ্গলবিধি প্রচার—এ সবই সম্ভবতঃ বিষ্ণু-ভক্ত সাধক ও ধর্মগুরুদের রূপক কাহিনীর মাধ্যমে বিষ্ণু প্রচার ও বিষ্ণু পূজার প্রতি সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা হতে পারে। তবে জগৎ-স্রষ্টা সর্বশক্তিমান ভগবান যখন আপনার ক্রীড়াচ্ছলে সর্ববস্তুতে সর্বরূপে বিরাজ করেন তখন তাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই ঘটতে পারে। তাঁর ইচ্ছায় মানুষের কল্পনাশক্তির উন্মেষ, তাঁরই অভিলাষে জীবের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ। আবার তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্টির ধ্বংস বা রক্ষণ।

পুরাণকারের কল্পনার মধ্যে আরও এক তাৎপর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুর প্রথম অবতার 'মৎস্য'র কল্পনার সঙ্গে মহা ভয়ঙ্কর প্লাবনে পৃথিবীর জলমগ্ন হওয়া ও মহা নৌকায় সৃষ্টির বীজ রক্ষা করার কল্পনার মধ্যে

জটিলতা নেই। দ্বিতীয় অবতার 'কূর্ম' রূপ কল্পনার মধ্যেও সেটি বিদ্যমান রয়েছে। তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই সম্ভবত সলিলে পরিপূর্ণ ছিল এবং জলচর প্রাণীরাও হয়তো বিশালকায় ও প্রধান প্রাণী হিসাবে অবস্থান করত। 'কূর্ম' অর্থ হলো 'কচ্ছপ'—যে প্রাণীর সৃষ্ট ত্বক পাথরের মতো কঠিন ; তীক্ষ্ণ শলাকাও সহজে বিদ্ধ হয় না। সুবিশাল কূর্ম-পৃষ্ঠের উপর মন্দর পর্বত স্থাপনের কল্পনা এই কারণেই হয়তো করা হয়েছে।

কূর্মাবতারে বিষ্ণুর প্রধান কর্মবৈশিষ্ট্য ছিল সমুদ্র মন্থনে দেবতা ও দানবদের সাহায্য করা। সাগর মন্থনে মহালক্ষ্মী উত্থিতা হয়েছিলেন। সম্ভবত ঋগ্বেদের যুগের পর এই প্রথম ভুবনশ্রী সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা মানুষের মনে জেগেছিল আর সে ধারণা লক্ষ্মী-কল্পনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল। কূর্মপুরাণে মহালক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র থেকে উত্থিতা হলে বিষ্ণু তাঁকে গ্রহণ করেন। তখন দেবতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে দেবদেবেশ ! কে এই বিশালাক্ষী দেবী ?" বিষ্ণু লক্ষ্মী দেবীর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, "এই দেবী মহালক্ষ্মী। ইনি মৎস্যরূপা ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি। ইনি আমার দৈবী মায়া—ইনি অনন্তা ও আমার প্রিয়। জগতকে আমার মায়াবী শক্তিই ধরে আছে। এই মায়ার জালে দেব-দানব-মানুষের সঙ্গে সমুদয় বিশ্বসংসারকে আমি আবদ্ধ করে সংহার ও সৃষ্টি করি। উৎপত্তি, প্রলয়, জীবকুলের জন্ম-মৃত্যু ও আত্মাকে বিদ্যাদ্বারা জেনে জ্ঞানীরা আমার মায়ার পাশ ছিন্ন করে মুক্ত হন। অপরূপা মহালক্ষ্মীই আমার সর্বশক্তি। ইনিই সেই জগৎ প্রসবিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।" কে বলতে পারে সাধারণ মানুষকে ভুবনশ্রী মহালক্ষ্মীর ধারণায় সচেতন করার জন্যই হয়তো সমুদ্র মন্থন উপাখ্যানটি কল্পিত হয়েছিল।

মহাভারতে জলধি মন্থনের কাহিনী বড় বিচিত্র ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের উপখ্যানটি এই রকম :—

মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে মহালক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করলে বিষ্ণু চিন্তা করলেন যে লক্ষ্মীকে সাগর গহ্বর থেকে উদ্ধার করতে হবে। সেজন্য সাগর মন্থনের দরকার। সে উদ্দেশ্য সফল করতে দেব গদাধর ব্রহ্মাকে ডেকে

বললেন, "দেব পদ্ম যোনি! আপনি দেবাসুরকে একত্রিত করে ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের উদ্যোগ করুন। সাগর মন্থনে অমৃত উত্থিত হবে এবং সেই অমৃত-পীযূষ পান করলে দেবগণ অমরত্ব লাভ করবে।"

বিষ্ণুর কথা শুনে ব্রহ্মা দেবতাদের ও অসুরদের ডেকে বললেন, "দেবগণ ও অসুরগণ! তোমরা ঝগড়া বিবাদ বিস্মৃত হয়ে পরস্পর সন্ধি করো এবং ক্ষীর-সাগর মন্থনে ব্রতী হও। বিষ্ণুর কথা মতো সাগরের মধ্যে যে সব রত্নরাজি হয়েছে তোমরা সে সব লাভ করে পরম ঐশ্বর্যশালী হও এবং অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করো।"—

লোকপিতামহ ব্রহ্মার কথায় রত্ন ও অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবাসুর সন্ধি করলো এবং সমুদ্র মন্থনের পরিকল্পনা কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কে উৎসুক হয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলো, "দেব পিতামহ। ক্ষীর-সাগর কেমন করে মন্থন করা হবে সে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিন।"

পদ্মযোনি বললেন, "দেব জনার্দন আমাকে সাগর মন্থনের উপায় বলে দিয়েছেন। তোমরা পৃথিবীর যাবতীয় ওষধি সাগর জলে নিক্ষেপ করো। তারপর মন্দর পর্বতকে স্থানচ্যুত করে সমুদ্র মধ্যে রেখে নাগরাজ বাসুকিকে রজ্জুরূপে গ্রহণ করে পর্বতে বেড় দিয়ে মন্থন করতে হবে। তোমরা সেই মতো ব্যবস্থা করো।"—

তখন উচ্চচূড় মন্দর পর্বতকে স্থানচ্যুত করার জন্য দেবগণ চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও তারা সফল হলো না। পরে মহাবলশালী মহীধর মন্থরাচল উপ্‌ড়ে এনে সমুদ্র গর্ভে স্থাপন করলেন। জলাধিপ বরুণ দেবকে পর্বতের ভার ধরে রাখতে বলায় বরুণ জানালেন যে তিনি ঐ প্রবল ভার ধরে রাখতে পারবেন না। আর কোনো উপায় না দেখে দেবতারা তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে জগতপ্রভু কৃপা পরবশ হয়ে এক মহাকায় কূর্মের রূপ ধরে জলমধ্যে মন্দরকে তাঁর পৃষ্ঠের উপর ধারণ করে রাখলেন। তারপর নাগরাজকে মন্থন রজ্জু ও মন্দরকে মন্থন দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হলো। দৈত্যরা সর্পরাজের শিরোভাগের দিকে রইলো এবং বাসুকির শিরোদেশ ধরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করতে

লাগলো। দেবতারা নাগরাজের পশ্চাতভাগে দাঁড়িয়ে তার লেজটি ধরে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করতে লাগলো। মন্দরের ঘূর্ণনে ক্ষীর-সাগরের জলে উঠলো প্রচণ্ড আলোড়ন, উথাল-পাথাল করতে লাগলো বিঘূর্ণিত জলধি-সলিল। ঘর্ষণ-ক্লান্ত মহাশক্তিধর নাগরাজ বাসুকি অত্যন্ত কাহিল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকলে সেই দীর্ঘশ্বাস ঘনায়িত হয়ে আকাশে মেঘরূপে সঞ্চারিত হলো। সেই মেঘদল হতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দেবাসুর সবাই বৃষ্টির জলে শ্রম দূর করলো। এদিকে নিষ্পেষিত বাসুকি কাতর যন্ত্রণায় মহাশব্দ করতে থাকলে অসুরগণ ভীত হয়ে কম্পিত কলেবর হলো এবং বিষাক্ত সর্পের নিশ্বাসের জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো।

অন্যদিকে মন্দরের প্রবল আন্দোলনে বরুণদেব অস্থির হয়ে উঠলেন। সামুদ্রিক জীবেরা প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মহামৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো। তবে ওষধির রস তাদের অনেককেই বাঁচিয়ে রাখলো। দেবাসুরগণ অপরিসীম পরিশ্রম করলেও অমৃত মিললো না। তখন সকলে কাতরভাবে ব্রহ্মাকে বললো, "দেব পিতামহ! আপনার আদেশ মতো আমরা প্রাণের শক্তি উজার করে সাগর মন্থন করলুম, কিন্তু হায়! পরিশ্রম সার হলো! এখন আমাদের শক্তির কণামাত্র অবশিষ্ট নেই।"—

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন, "দেব জনার্দন! দেবাসুর সমুদ্র মন্থনে অশক্ত হয়ে পড়েছে। এখন আপনার সাহায্য ছাড়া কারও সামর্থ নেই যে পুনরায় সাগর মন্থন করে।" এ কথা শুনে বিষ্ণু যোগপ্রভাবে দেবতাদের মধ্যে আপন শক্তি সঞ্চারিত করলেন। আবার সমুদ্র মন্থন শুরু হলো। এবার সর্বপ্রথম জলধি-জল ভেদ করে উঠলেন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান সোম। তারপর ক্রমে ক্রমে উত্থিত হলো শ্বেতরাজহস্তী ঐরাবত, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত পুষ্পপাদক, রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মনি এবং সব শেষে অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে উঠে এলেন বৈদ্য ধন্বন্তরি। রত্নাকরের অভ্যন্তর থেকে বিপুল রত্নারাজি লাভ হচ্ছে দেখে আরও রত্নলাভের আশায় দেবাসুর সকলে বারবার সাগর মন্থনে রত হলে জলাধিপ বরুণ সমুদ্র-আলোড়নে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর সাগর-

রাজ্য বুঝি ছারখার হয়ে যায়! কি হবে উপায়! মন্ত্রীরা তাঁকে পরামর্শ দিলো; "জলেশ! আপনি মহালক্ষ্মীকে (যিনি স্বর্গচ্যুতা হয়ে এখানে কমল বনে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন) বিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করুন। তাহলে বিষ্ণুদেব সমুদ্র মন্থন বন্ধ করতে আদেশ দেবেন। লক্ষ্মীকে ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে।" তখন মন্ত্রীদের পরামর্শমত বরুণ-দেব মহালক্ষ্মীকে বন্দনা করে তাঁকে নানা অমূল্য ভূষণে সাজিয়ে বিষ্ণুর কাছে নিয়ে গেলেন ও রমাকে চক্রপাণির হাতে সমর্পণ করে বললেন "প্রভু! দেবাসুরদের সাগর মন্থন কর্মে ক্ষান্ত দিতে বলুন। তা না হলে আমার জলধি রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ করে এবং কৌস্তভ মনি বুকে ধারণ করে সন্তুষ্ট চিত্ত নারায়ণ সমুদ্র মন্থন থেকে দেবাসুরকে বিরত হতে আদেশ দিলেন। সাগর মন্থন সমাপ্ত হলো।

এদিকে অসুররা দেখলো যে সমুদ্র থেকে আহৃত সমস্ত রত্নই দেবতারা নিয়ে নিয়েছে। বিষ্ণু নিয়েছেন মহালক্ষ্মী ও কৌস্তভমনি, দেবরাজ ইন্দ্র নিয়েছেন ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা। এসব দেখে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো এবং দেবতাদের কাছ থেকে অমৃত-ভাণ্ড কেড়ে নিলো। তখন আবার দেবাসুরের মধ্যে শুরু হলো মহারণ। যে যাকে পারে মারতে লাগলো। এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে দেবাদিদেব মহেশ্বর যিনি সমুদ্র মন্থনে উপজাত গরল্ আপন কণ্ঠে ঢেলে নিয়ে জগতকে বিষের জ্বালা থেকে রক্ষা করে 'নীলকণ্ঠ' হয়েছেন, তিনি মধ্যস্থ হয়ে দেবাসুরের কলহ থামিয়ে তাদের বললেন, 'দেবগণ ও অসুরগণ! তোমরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ো না। অমৃতে তোমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। সকলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। তোমাদের প্রত্যেককে সুধা বিতরণ করবেন নারায়ণ।"—শিবের কথায় দেবাসুর সবাই স্থির হলে বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে মায়ার প্রভাবে তাদের ভুলিয়ে নিদ্রাভিভূত করলেন। কামোন্মাদনায় অস্থির হয়ে অসুরকূল নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, তারপর মোহিনীরূপী বিষ্ণুর নূপুর নিক্কণ শুনে তাদের চেতনা ফিরে এলো।

অপূর্ব যৌবন-শ্রী মোহিনীকে দেখে তার মায়ায় ভুলে অসুররা তাঁকে বললো, "কে তুমি অলোক সামান্যা নারী" চোখের মদির মায়ায় তাদের বিহ্বল করে কপট ভাষায় মোহিনীরূপী জনার্দন বললেন, "আমি সাগরোদ্ভূতা মোহিনী। তোমাদের কোলাহলে আমি বিরক্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছি, তোমরা কি কারণে বিবাদ করছো?"

তখন দেবাসুর সবাই মোহিনীর মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকেই অমৃত-বণ্টন করতে অনুরোধ করলে, জনার্দন সুধাভাণ্ডটি নিয়ে দেবতাদের এক সারিতে ও অসুরদের অন্য সারিতে বসিয়ে সুধা বিতরণ করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি বললেন, "অসুরগণ! দেবতারা তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তাই তাদের সুধা বণ্টন করবো আগে, তারপর তোমাদের দেবো।"

"বেশ, তাই হোক, যেমন তোমার ইচ্ছা"—মোহমুগ্ধ অসুররা বললো।

তখন মোহিনী বেশধারিণী বিষ্ণু একে একে সকল দেবতাকে অমৃত বণ্টন করে সুধাভাণ্ডের অবশিষ্ট সুধা নিজে গ্রহণ করলেন। বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ অসুররা অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী মোহিনীকে বিমুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। এই অবসরে অসুর রাহু গোপনে 'সুধাভাণ্ড' চুরি করে ভাণ্ডের গায়ে লেগে থাকা অমৃত লেহন করতে আরম্ভ করলে চন্দ্র তা দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। বিষ্ণু তখনই সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করে রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। কিন্তু অমৃত লেহন করায় রাহুর মৃত্যু হলো না, সে দুই খণ্ড দেহবিশিষ্ট হয়ে জীবিত রইলো। তার মস্তকভাগের নাম হলো 'রাহু', অপর অংশের নাম হলো 'কেতু'।

ব্যাপার দেখে অসুরদের ঘোর কেটে গেল। তারা বুঝতে পারলো যে দেবতারা তাদের ছলনা করে সমস্ত সুধা পান করেছে—এই উদ্দেশ্য যে তারাই কেবল অমরত্ব লাভ করবে। তখন অসুররা ভয়ঙ্কর ক্রোধে দেবগণকে আক্রমণ করলো। কিন্তু ক্লান্ত তারা সুধা-বলে বলীয়ান দেবতাদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করলো। সমুদ্র-মন্থনে আহৃত কোনো বস্তুরই তারা অধিকার পেলো না।

মহাভারতে বর্ণিত সমুদ্র-মন্থনের এই হলো কাহিনী। বলাবাহুল্য যুগ যুগ

ধরে এ উপাখ্যান জনমনে প্রভাব ফেলে আসছে। সমুদ্র-মন্থন রূপক-কাহিনী—কল্পনাশ্রিত। দেবাসুরের সন্ধি ও কলহ হয়তো পৌরাণিক যুগে যুগে রূপায়িত বৈদিক যুগের কোনো ঘটনা। বৈদিক ঋষিদের অমৃত-ভাবনা —মানুষ অমৃতের সন্তান এই ধারণা হয়তো পৌরাণিক এই রূপক কাহিনীর অন্তরালে ঢাকা আছে। মহাভারতে উল্লিখিত সমুদ্র-মন্থন কাহিনীতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এখানে কূর্মকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে দেখানো হয়নি। কেবল বলা হয়েছে সমুদ্র মধ্যে কূর্মরাজ মন্দরাচলকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। সম্ভবত কূর্মপুরাণ মহাভারতের পরবর্তী সময়ে রচতি হয়েছে। তাহলে কি মহাভারতের সমুদ্র মন্থনের কাহিনীকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে কূর্মাবতার কল্পিত হয়েছেন?

মনে হয় তা ঠিক নয়। 'কূর্ম' বিষ্ণুর অবতার রূপেই কল্পিত হয়েছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ও বিষ্ণুপুরাণে 'কূর্মা'বতার বিষ্ণুর অবতার এ উল্লেখ আছে।

৫

ভগবানের তৃতীয় অবতার হলেন বরাহাবতার। বরাহমূর্তির লীলাতত্ত্ব বরাহপুরাণে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এই পুরাণকে সাত্বিক পুরাণ বলা হয়। প্রলয় জলোত্থিতা বসুধার প্রশ্নানুসারে বরাহমূর্তি ধারণ করে ভগবান বিষ্ণু যে সব অপূর্ব তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছিলেন, সে সবই বরাহপুরাণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মের গভীর তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, ঈশ্বরের বিরাট রূপ বৈভব, বিষ্ণু পূজা পদ্ধতি, ধর্ম ব্যাধ প্রভৃতি অপূর্ব উপাখ্যান, দেবগণের উৎপত্তির বিবরণ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, দীক্ষা বিধি, নানাতীর্থকৃত্য, দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্যতত্ত্ব ইত্যাদি বরাহপুরাণের আলোচ্য বিষয়।

একদন্তী মহাবরাহ রূপ ধারণ করে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই আদি যুগে মহাপ্লাবনের ফলে ধরিত্রীর অধিকাংশই সম্ভবত জলমগ্ন ছিলো। তারও আগে বিশ্বসংসার কেমন ছিলো তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কূর্মপুরাণে। তখন জগৎসংসার একার্ণব ও বিভাগশূন্য ঘোর তমোময় ছিলো। বায়ুবেগ ছিলো না কোথাও। সবই ছিলো অজ্ঞাত—অপরিস্ফুট—অনাগত। ক্রমে সেই একার্ণবতা বিনষ্ট হলে সে সময় স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে সহস্রনেত্র ও সহস্রপদ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সুবর্ণকান্তি সহশ্রশীর্ষ অতীন্দ্রিয় পুরুষ তখন অগাধ সলিলে শায়িত ছিলেন। সে কারণে তাঁর নাম হয় নারায়ণ।

"অপো নারা ইতি প্রোক্তা অপো বৈ নরসূনবঃ
অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ 'অপ'-নারা নামে খ্যাত অপ্ নর সূন—সেই অপ (জল) তাঁর অয়ন (আশ্রয়); তাই তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত। তিনি সহস্রযুগ পর্যন্ত শৈশবকাল ভোগ করে নিশাবসানে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

তারপর তিনি পৃথিবীকে সলিল মধ্যে নিমগ্না জেনে তার উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হন। পরমপুরুষ নারায়ণ বরাহের রূপ গ্রহণ করে পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করেন এবং দন্তদ্বারা ধরিত্রীকে উত্তোলন করে রক্ষা করেন। মহাবলী দৈত্য হিরণ্যাক্ষের বলদর্পে ভীতা ধরিত্রী রসাতলে নিমগ্না হয়েছিলো। পৃথিবী ঐভাবে উত্থিতা হয়ে বরাহদন্তে স্থির হয়ে অবস্থান করলে বরাহাবতার তাঁকে সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও সদাচার সম্পর্কে উপদেশ দেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ শিশুর উৎপত্তি হয়—তিনিই ক্রমে বিশাল বপুলাভ করেন। তিনিই বরাহাবতার।

"ইত্যাভিধায় তো নাসা বিবরাৎ সহসা অনঘ!
বরাহ তো কো নিরগাদঙ্গুষ্ঠ পরিমাণক॥"

হিরণাক্ষ্য দৈত্য বধ, পৃথিবীর গর্ভে নরক নামক অসুর উৎপাদন ও জল-মগ্না পৃথিবীর উদ্ধার সাধন—এই তিনটি বিশেষ কর্মসাধনের জন্যই বরাহাবতারের আবির্ভাব। বরাহ ভগবান কর্তৃক হিরণাক্ষ্য বধের কাহিনী এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মদমত্ত হিরণাক্ষ্য পৃথিবী দাপিয়ে ক্লান্ত হয়ে তাকে (পৃথিবীকে) মাদুরের মতো জড়িয়ে শুয়েছিল। বরাহরূপী বিষ্ণু পশুর মতো ঘ্রাণ নিতে নিতে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে দৌড়ে এসে তার মাথা নীচু করে পৃথিবীকে দন্তে তুলে ধরলেন। তখন হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে বরাহের ভীষণ যুদ্ধ হলো, দৈত্যরাজ সেই মহাহবে পরাজিত হলো। বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে সংহার করলেন।

মীন ও কূর্মের মতোই বরাহ দেবতার কল্পনা বেশ কিছুটা উদ্ভট। হিরণ্যাক্ষ বধ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সে পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়িয়ে উপাধান করে শায়িত ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে তার মাথার নীচের দিক দিয়ে পৃথিবীকে মুখ করে তুলে ধরেছিলেন। বৈদিক যুগেও ঋষিদের কাছে পৃথিবীর আকার, গতিশীলতা ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব যখন অজানা ছিল না, তখন পৌরাণিক যুগে 'পৃথিবীকে

মাদুরের মতো মুড়ে উপাধান করে শয়ন করা' নিতান্ত অজ্ঞানোচিত ধারণা। তাছাড়া পৃথিবীর গর্ভে বরাহ কর্তৃক নরক নামক অসুর উৎপাদন কেবল পুরাণকারের কল্পনাতেই সম্ভব।

বরাহাবতারের আবির্ভাব যে রকম কল্পনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় তখনও (এটিও সত্য যুগের কাল) মহাপ্লাবনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। সম্ভবতঃ সে সময় অথবা এমনও হতে পারে পুরাণ রচনাকালের সময় অতিকায় একদন্তী বরাহের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। দন্তের সাহায্যে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে কন্দমূলাদি উত্তোলন করে আহার করত। বরাহের এই কার্যই কি রূপকচ্ছলে রসাতল থেকে পৃথিবী উত্তোলনের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে ? আরও এক লক্ষণীয় বিষয় যে বিরাটভূ-বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই বরাহাবতারের আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে। মীন ও কূর্ম অবতারের (এঁরাও সত্যযুগে আবির্ভূত হয়েছেন বলে বর্ণনা করা হয়) মতো নয়। এই প্রথম দুষ্কৃত দমনে অবতারের আবির্ভাব হয়েছে—হিরণাক্ষ্য হলো ঐ দুষ্কৃত।

৬

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের চতুর্থ অবতার হিসাবে নৃসিংহ বা নরসিংহ দেবের কথা বলা হয়েছে। বিষ্ণু এই মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে মহাবলী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন এবং তার অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে এ কথাই বলা হয়েছে।

এ পর্যন্ত পৃথিবীর পরিচিত জীবগণের রূপ বা আকৃতি নিয়েই ঈশ্বরের অবতার পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে মানবরূপে তাঁদের কল্পনা করা হয়নি। তাঁরা সবাই অন্য জীব—মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ। নৃসিংহ কিন্তু কোনোও যুগে পৃথিবীর পরিচিত প্রাণী হিসাবে গণ্য নয়, যদিও প্রাচীনকাল থেকেই 'সিংহ' বলশালী পশু হিসাবে পরিচিত ছিল।

মৎস্য, কূর্ম ও বরাহাবতারের মতো চতুর্থ অবতার নরসিংহদেবও অযোনিসম্ভব। বিষ্ণু সরাসরি ঐ বিচিত্র দেবরূপ ধরে অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে ধরণী ত্রাণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিপীড়িত জীবের কাতর আহ্বানে তাঁর বৈকুণ্ঠের আসন টলে উঠেছিল। সৃষ্টি-পালক তাঁর সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

হিরণ্যাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপু ছিল দুই ভাই—হিরণ্যাক্ষ্য ছিল জ্যেষ্ঠ। পুরাণ গ্রন্থে তাদের বংশ পরিচয় যা দেওয়া আছে তা হলো—

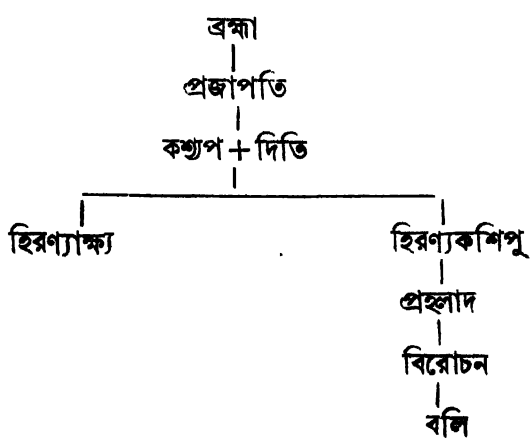

দুই মহাবলী অসুরই পরাক্রান্ত বীর ছিল। তাছাড়া তারা মায়া গুণে ছিল সিদ্ধ। তারা কি অতীত যুগের কোনো অনার্য বংশীয় বীর ছিল? দেবতাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কাহিনী কি আর্য অনার্য বিরোধের রূপক উপখ্যান যা কল্পিত রূপে পল্লবিত হয়ে পুরাণের আখ্যান বস্তু হয়েছে? অথবা বিষ্ণু মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য এই উপাখ্যান কল্পিত হয়েছে? অথবা ভগবান নৃসিংহ অবতার সত্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ঈশ্বর সব কিছুই হতে পারেন বা হন; তিনি সমস্ত কিছুই করতে পারেন বা করেন। মানুষের কল্পনাতেও তাঁর অধিষ্ঠান। আপন স্বরূপ বোঝবার তাড়নায় মানুষ ঈশ্বরকে নানা ভাবে খুঁজে ফেরে—জীবনের রহস্য তো এটাই। আর মহাকালের স্রোতে ভেসে ভেসে জীবন চলার পথে চলতে চলতে মানুষের এই স্বরূপান্বেষণই বুঝি লীলাময় ভগবানের লীলা।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সিংহের প্রাদুর্ভাব ছিল। পৌরাণিকযুগে বলশালী সিংহের আক্রমনে অনেক পরাক্রান্ত বীর যোদ্ধা বা রাজা মহারাজার মৃত্যু হয়েছে পুরাণাদি গ্রন্থে এমন ঘটনার নজির আছে। বিষ্ণুর অবতার রূপে নরসিংহ মূর্তির কল্পনা হয়ত তেমন কোনো ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবে। হিরণ্যকশিপু নামে কোন অনার্য রাজা হয়ত সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়ে থাকবে। ঈশ্বরের অবতার সম্পর্কে নানারূপ অস্বাভাবিক কল্পনা করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রমাণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তা খর্বই করেছে ধর্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমন্য পুরাণকারেরা।

আমরা পুরাণ পাঠ করলে লক্ষ্য করি যে 'মৎস্য' পুরাণের একটি অধ্যায়ে সূত মুনি হিরণ্যকশিপুর বধবার্তা শুনিয়ে কলুষ নাশন নৃসিংহ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কাহিনী এই রকম।

পুরাকালে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যদের এক আদিপুরুষ ছিল। সে একাদশ সহস্র বর্ষ (?) ধরে কৃত স্নান হয়ে মৌন ব্রত নিয়ে প্রবল তপস্যা করেছিল। তার নিশ্ছিদ্র তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম ও বিনয়ে

প্রীত হয়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "তোমার ঐকান্তিক তপস্যায় আমি মুগ্ধ। তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"—"হে পরম দেবতা!" বিনয় বচনে হিরণ্যকশিপু বলল, "আপনি যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্টই হয়েছেন, তবে এই বর চাই যে আমি যেন দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস কারও দ্বারা নিহত না হই। মানুষ বা পিশাচ যেন আমাকে হত্যা করতে না পারে। ঋষিরা আমাকে অভিসম্পাৎ দিতে যেন পরাঙ্মুখ হন। তাছাড়া অস্ত্র, শস্ত্র, পর্বত, পাদপ, এ রকম কোনো বস্তুতেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। কোনো শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা আমার যেন মৃত্যু না হয়। চন্দ্র, সূর্য, পবন ও হুতাশন এ সবই আমার অধীন হোক।"

ব্রহ্মা বললেন, "বেশ, তোমাকে তোমার আকাঙ্খা মতো বর দিলাম। তুমি তোমার বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করবে।" একথা বলে তিনি তাঁর হংস-বিমানে উঠে ব্রহ্ম লোকে চলে গেলেন।

ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে যে রকম বরদান করলেন তার দ্বারা সে প্রায় অমরত্ব লাভ করল। "দৈত্য এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে যা ইচ্ছা তাই-ই করবে।"—নিজেদের মধ্যে একথা আলোচনা করে ঋষি, গন্ধর্ব, নাগ ও দেবতারা লোকপিতামহের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "পিতামহ! দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু আপনার বরে অসীম শক্তি লাভ করেছে। বলদর্পে এবার সে নিশ্চয়ই জগৎ সংসার ধ্বংস করবে। আমরা অচিরকাল মধ্যে শেষ হয়ে যাব। এখন আমরা প্রবল ভয়ের তাড়নায় অসহায় বোধ করছি। প্রভু! আপনি এর প্রতিবিধান করুন।"

পদ্মযোনি চিন্তান্বিত ভাবে ধীরে ধীরে বললেন, "হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তপস্যা করেছিল, আর তাই তপস্যার অনুরূপ ফল তাকে প্রদান করেছি। এখন সে যদি অহংকারের বশে ন্যায় ধর্ম বিস্মৃত হয়ে পাপাশ্রয়ী হয় তাহলে সে পাপের ফলে তপস্যার পুণ্য নষ্ট হলে তার পতন হবে। বিষ্ণু তাকে সংহার করবেন।" ব্রহ্মার কথা শুনে সকলে আনন্দিত চিত্তে আপন আপন নিবাসে ফিরে গেলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে তার কাঙ্খিত বর লাভ করে বলদর্পে দর্পিত হয়ে দেবতা মানুষ সকলের উপর অত্যাচার করতে লাগল। ঋষিরা উৎপীড়িত হয়ে তপস্যা, বেদপাঠ প্রভৃতি নিত্য-কর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। কত গৃহস্থ নিঃস্ব হয়ে গেল; কত মানুষ হিরণ্যকশিপুর রোষবহ্নিতে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। শেষে দৈত্যপতি স্বর্গ-রাজ্য আক্রমণ করে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গ অধি-কার করে নিল। তখন স্বর্গহারা অসহায় দেবগণ আকুল হয়ে পরম প্রভু বাসুদেবকে ডাকতে লাগল—

"ওগো পরম প্রভু, মঙ্গলময় বিভু! আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে আমরা বলবীর্য হারিয়ে হৃত সর্বস্ব হয়ে অসহায় হয়েছি। হয়ত শীঘ্রই সবাই বিনাশ হবো। হে পরম দেবতা! হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে তার করাল গ্রাস থেকে আমাদের রক্ষা করুন।"

দেবগণকে অভয় দান করে বিষ্ণু বললেন, "তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি শীঘ্রই দৈত্যকে সংহার করব। পাপাচারে তার পুণ্য ক্ষয় হয়েছে। তোমরা কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বর্গে বসবাস করতে পারবে।"

দেবগণকে অভয় দিয়ে বিদায় করে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে নিধন করার জন্য সঙ্কল্পিত হলেন। তিনি ওঙ্কারকে সহায় হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নরসিংহ অবয়ব নিয়ে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুর কাছে গেলেন। তাঁর পরমজ্যোতির্ময় দেহার্ধ নরাকার ও অপরার্ধদেহ সিংহের আকার বিশিষ্ট। তিনি নরসিংহ রূপে হাতে হাত রেখে অদূরে দাঁড়িয়ে দৈত্য-রাজের সভাগৃহ দেখলেন। হিরণ্যকশিপুর সভাগৃহ দিব্য, সুরম্য, মনোজ্ঞ ও সর্বকাম সমৃদ্ধ। এই রমনীয় সভায় অসুররা সমবেত হয়েছে। সভা-মধ্যে সিংহাসনের উপর অসুরপতি হিরণ্যকশিপু সমাসীন। অপ্সরাগণ তার সেবা করছে—কেউ চামর ব্যজন করছে, কেউ বা পদসেবা করছে। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, পৌত্র বিরোচন ও প্রপৌত্র বলি সকলেই সভাগৃহে উপস্থিত রয়েছে।

এদিকে সভাগৃহ থেকে দৈত্যরা সকলেই নরসিংহ দেবকে দেখতে পেল। প্রহ্লাদ ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির মতো অবতার পুরুষকে দেখে বলল, "ইনি সিংহ নন। মনে হচ্ছে ইনি জগৎ প্রভু শ্রীহরি।"

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু দৈত্যদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকে নিকটে আসতে দেখে হিরণ্যকশিপুর দৃষ্টিতে ক্রোধ ও অবজ্ঞা ফুটে উঠল। তা দেখে নৃসিংহের মুখে ইষৎ হাসি খেলে গেল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "দৈত্য! অহংকারে মত্ত হয়ে তুমি পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করছে। তোমার পুণ্য ক্ষয় হয়েছে। পাপের পরিণামে তুমি বিনাশ হবে। আমি তোমাকে সংহার করে জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনব। এস, যুদ্ধ কর।"

নৃসিংহদেবের কথা শুনে হিরণ্যকশিপু ভয়ঙ্কর ক্রোধে অগ্নি সমান জ্বলে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "হে বিচিত্র জীব! তোমার বড় আস্ফালন দেখছি। মরতে যদি সাধ হয়েছে তবে এস, রণসাধ এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি।" —বলতে বলতে সে কৃপাণ উন্মুক্ত করে অগ্রসর হলো। তখন প্রহ্লাদ তার পিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। "পিতা! আপনি যুদ্ধ করবেন না— নিবৃত্ত হোন। ইনি কোনো সিংহ বা বিচিত্রজীব নন; ইনি সাক্ষাৎ জগৎ পালক বিষ্ণু। যদি ইনি বিরূপ হন, তবে আমাদেরর পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। আসুন এঁকে স্তুতির দ্বারা তুষ্ট করি। এঁর সঙ্গে কলহ করা আমাদের কখনই উচিৎ নয়।"

"চুপ কর শত্রু-প্রশংসাকারী পুত্র।"— গর্জে উঠে হিরণ্যকশিপু পুত্রকে যথেচ্ছা তিরস্কার করল। তরপর নৃসিংহ দেবের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধে বিষ্ণুর বিক্রমের কাছে সে পরাস্ত হলে দৈত্যরা যে যেদিকে পারল প্রাণ ভয়ে পলায়ন করল। প্রহ্লাদ হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে নৃসিংহদেবের স্তুতি করতে লাগল। হিরণ্য-কশিপু বিষ্ণু মায়ায় বলবীর্য হারিয়ে অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। নৃসিংহ ধীরে ধীরে দৈত্যপতির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর অনায়াস ভঙ্গিমায় জড় পুত্তলিকাবৎ হিরণ্যকশিপুকে দুই হাতে ধরে জানুদ্বয়ের উপর স্থাপন করে আঙুলের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ

করে তাকে গতাসু করলেন। দুষ্কৃতের বিনাশ হলো, সাধুরা পেল পরিত্রাণ —পৃথিবীতে ফিরে এল শান্তি।

*　　*　　*

ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন-কথায় হিরণ্যকশিপুর সংহার বৃত্তান্ত একটু অন্য-রকম। শিশুকাল থেকেই জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে প্রহ্লাদের মধ্যে হরিভক্তির প্রাবল্য দেখে দৈত্যরাজ পুত্রকে অকথ্য নির্যাতন করে তাকে মৃত্যুর মুখে পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে তাব মন থেকে হরির প্রতি ভক্তি দূর করে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনোও ফল হয় না। প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। তখন বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু পুত্রকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলে প্রতিবারেই ভগবান বিষ্ণু তাঁর প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করলেন। শেষে একদিন অসুর রাজ বিরক্ত হয়ে পুত্র প্রহ্লাদ-কে বলল, "তুমি বলছ যে তোমার হরি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র বিরাজ করছে। তোমাকে আমি এখনই হত্যা করবো; সেই বিষ্ণু এসে কি তোমায় রক্ষা করবে?" প্রহ্লাদ বিনয় বচনে বলল, "তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করবেন।"

"তুমি কি 'নাম' উচ্চারণ বন্ধ করবে না?"

"না পিতা, আমার জীবন থাকতে এ নাম আমি শরণ করে যাব। আমি বুঝতে পেরেছি একমাত্র হরিনামই সার।" প্রহ্লাদ দৃঢ় স্বরে বলে।

"স্তব্ধ হও বেয়াদপ," ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চীৎকার করে ওঠে হিরণ্যকশিপু, "দেখাও কোথায় রয়েছে তোমার হরি। ওই প্রাসাদ-স্তম্ভের মধ্যে কি সে আছে? তার নাকি অসীম ক্ষমতা?"

প্রহ্লাদ স্থির কণ্ঠে বলে, "তিনি ইচ্ছা করলে ঐ স্তম্ভের মধ্যেও থাকতে পারেন। বিষ্ণু জগন্নিবাস, বিশ্বের সর্ববস্তুর মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান।"

পুত্রের কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সিংহাসন থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে হিরণ্যকশিপু সম্মুখের প্রাসাদ-স্তম্ভে পদাঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভ ভেঙে পড়লে অসুররাজ ও রাজসভায় উপস্থিত অন্য পাত্র মিত্ররা অবাক বিস্ময়ে দেখল যে ভগ্ন স্তম্ভের মধ্য থেকে বেরিয়ে

এলেন নৃসিংহদেব। বিস্মিত হিরণ্যকশিপু ব্যাপার ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন এবং অসুর রাজকে দু'হাতে ধরে আপন জানুতে স্থাপন করে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাকে বধ করলেন। বলা বাহুল্য এ কাহিনী কাল্পনিক।

নৃসিংহ অবতাররূপে বিষ্ণুর মর্ত্যে আগমন ও হিরণ্যকশিপু বধ—এ ঘটনা কাল্পনিক হোক, রূপক-কাহিনী হোক অথবা সত্য হোক এর উদ্দেশ্য যে বিষ্ণু মাহাত্ম্য ব্যক্ত করা সে সম্পর্কে মতদ্বৈত নেই। কিন্তু সেই কাজটি করতে গিয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে সীমিতই করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে তপস্যা বা উপাসনা করে হিরণ্য-কশিপু ব্রহ্মার অনুগ্রহ লাভ করেছিল। ব্রহ্মা তাকে অজেয় হবার বর দিয়েছিলেন, সে পরিচিত জাগতিক কোনো প্রাণীর হাতে নিহত হতো না, জলে স্থলে কোথাও তার মৃত্যু হতো না। আর সে জন্যই বিষ্ণু নরসিংহ মূর্তিতে আপন জানুর উপর তাকে নিহত করলেন। একথা মানতেই হবে যে অতি সুন্দরভাবে নরসিংহাবতার কাহিনী কল্পিত হয়েছে। জাগতিক সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরসম্ভূত, তাই ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ যে কোনো জীবের মধ্যেই ঘটতে পারে এবং তাই ঈশ্বরের কাছ থেকে অসুর বা নরের বর লাভ বিসদৃশ মনে হয় না। কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান দেবতাদের কেবল মঙ্গল চাইছেন আর অসুরদের বধ করছেন এই ব্যাপারটি বিসদৃশ মনে হয়। অবশ্য এ সম্পর্কে যুক্তির অবতারণা করে বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের সৃষ্ট যে জীব দুষ্ট ও পাপাচারী হয়ে পড়েছে তার শাস্তি অর্থাৎ কর্মফল ঈশ্বরই তাকে দেন। এ বুঝি তাঁর লীলা-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান তো তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জীবেরই মঙ্গল বিধান করবেন, তিনি শাসনে তর্জনে তাকে শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরের অবতারের ক্রোধাসক্ত হয়ে তাকে একেবারে সংহার করা এ ধরনের ব্যাপার বিসদৃশ। তবে জগৎ নিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছা ও কর্মের পরিমাপ ক্ষুদ্র জীব করতে পারে না —জন্ম-জীবন-মৃত্যু সবই তো লীলাময় ভগবানের লীলা —তাঁর মায়ার খেলা।

মনে হয় এই সকল অবতার কাহিনীর অধিকাংশই রূপকাশ্রিত বা কল্পিত। যার দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন ঈশ্বর ভক্তি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে তেমনই পাপ বা অন্যায়ের পরিণতির দিকটিও দেখান হয়েছে। তাছাড়া আর এক বড় কারণ হলো ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত স্থূল ভাবাদর্শের বস্তু হয়ে পড়েছে।

নৃসিংহাবতারকেও পূর্ববর্তী তিন অবতারের মতো অযোনি সম্ভব কল্পনা করা হয়েছে। জগৎ পালক বিষ্ণু সরাসরি ঐ বিচিত্র দেবরূপ ধারণ করে অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করে পৃথিবীকে ত্রাণ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিপীড়িত জীবকুলের কাতর আহ্বানে তাঁর বৈকুণ্ঠের আসন টলে উঠেছিল। সৃষ্টি পালক তখন সৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা করে ছিলেন। পুরাণকারের এই কাহিনী কল্পনা কুসুমে গাঁথা। হয়ত ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থ চরিতার্থতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাহিনীর মাধ্যমে বিষ্ণু মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। এর প্রচেষ্টার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে ঈশ্বরের অবতারত্ব ও তাঁর লীলা-প্রকাশের চিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে পারে এবং তাদের নীতি ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করে রাখতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক এ সবের দ্বারা ঈশ্বরের গরিমার প্রকাশ তো হয়ই নি পরন্তু উদ্ভট কল্পনাগুলি মানুষের মানস দিগন্তের গণ্ডী না পেরোতে পেরে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের মহিমাকে খর্বই করে ফেলেছে।

পুরাণমতে হিরণ্যাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপু ছিল দুই ভাই। দুজনেই ছিল পরাক্রান্ত, বীর্যশালী ও বহুবিধ মায়াগুণে সিদ্ধ। শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের বর্ণনানুযায়ী দয়াময় ভগবান বিষ্ণু বিকট নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্য-কশিপুর নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন করেন। তারপর তিনি ব্রহ্মাকে মৃদু তিরস্কারও করেন, কারণ ব্রহ্মার দ্বারা মাঝে মাঝেই অসুরদের বরদান করে ফেলার জন্যই তাঁকে বাধ্য হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। এ সব করার পর নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে তার পিতার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করতে বারণ করেন এবং তাঁর হাতে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হওয়ায় প্রহ্লাদের উর্ধতম একুশ পুরুষের মুক্তি লাভ হয়েছে বলে জানান। কিন্তু প্রহ্লাদের

উর্ধতন একুশ পুরুষের যে অস্তিত্ব নেই, ভগবানের মুখ দিয়ে বরদান করানোর সময় ভাগবতকার তা লক্ষ্য করেনি। ভাগবতের এই বর্ণনাটুকু থেকেই কি প্রতিপন্ন হয় না যে অবতারতত্ত্ব যে ভাবাদর্শের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অনেকটাই সত্য উপলব্ধ প্রসূত নয় বরং উদ্ভট কল্পনার লেখনীতে এক বিচিত্র বর্ণনা যা পরবর্তীকালে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে। এসব উদ্ভট কল্পনা নিতান্ত ছেলেমানুষী ব্যাপার এবং ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়ই বহন করে। এগুলি যেন এক ধরনের রূপকথা। যার মধ্যে কল্পনার রং যুগের সীমাবদ্ধ ধারণাকে অতিক্রম করতে পারেনি, ভাবনার প্রসারতাও সেখানে কম এবং উপস্থাপনা স্বার্থ প্রণোদিত—দৃষ্টিভঙ্গি অনুদার।

হিরণ্যাক্ষ্য ও হিরণ্যকশিপু সুদূর অতীতকালে এরা কি কোনো অনার্য রাজবংশীয় বীর ছিল ? দেবতাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কাহিনী কি আর্য-অনার্য বিরোধের রূপক কাহিনী যা কল্পনার শাখা মেলে পল্লবিত হয়ে পুরাণের আখ্যানবস্তু হয়েছে ? অথবা ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই কল্প-কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে কিম্বা এ সমস্ত ব্যাপার অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতমন্য মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কে অলীক ধারণার রূপরেখা ?

সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে সিংহের প্রাদুর্ভাব ছিল। বলশালী সিংহের আক্রমণে অনেক পরাক্রান্ত বীর যোদ্ধা, রাজা মহারাজা বা দক্ষ শিকারীর মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনা উল্লেখ আছে। তাই এমন হতে পারে যে বিষ্ণুর অবতাররূপে নৃসিংহ মূর্তির কল্পনা পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবে অথবা হিরণ্যকশিপু নামে কোনো পরাক্রমশালী অনার্য রাজা সিংহের দ্বারা নিহত হয়ে থাকবে।

৭

পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার হিসাবে বামনাবতারের কাহিনী ব্রহ্মপুরাণ, বামনপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে গঙ্গাদেবীর মর্ত্যে আগমনের অন্য এক উপাখ্যানের সঙ্গে বামনাবতারের কাহিনী যুক্ত রয়েছে। কাহিনীর শুরুতে দেবর্ষি নারদ লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"পিতা! গঙ্গাদেবী কমণ্ডলুর মধ্য থেকে পুণ্যবাহিনী হয়েছেন। তিনি কি ভাবে মর্ত্যে উপনীত হলেন সে কথা আমাকে বলুন।" ব্রহ্মা বললেন, "পূর্বযুগে বলি নামে দেব শত্রু এক দৈত্য ছিল। সে ছিল অজেয় বীর। ধর্মপরায়ণতায়, যশগরিমায়, প্রজাপালনে, গুরু ভক্তিতে, সত্যবোধে, বলবীর্যে, ত্যাগে ও ক্ষমাগুণে সেকালে তিন ভুবনে তার সমতুল্য কেউ ছিল না।

দেবতারা তার শ্রীবৃদ্ধি দেখে যেমন ঈর্ষান্বিত হলো, তেমনি চিন্তিতও হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করল কি উপায়ে বলিকে জয় করা যায়। এদিকে সুশাসক দৈত্যরাজ বলির রাজ্য শাসনে ত্রিলোক নিষ্কণ্টক হলো। ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। আধি, ব্যাধি, শত্রু ভয়, অনাবৃষ্টি, অধর্ম, অভাব, দুর্জনের অত্যাচার উপদ্রব বলিরাজার রাজত্বে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না। তাই তার সমৃদ্ধি দেখে দেবতাদের চিত্তে বিক্ষোভ ঘটল। মাৎসর্য-বশে দৈত্যরাজকে ধ্বংস করার মতলবে তারা জগতপালক বিষ্ণুর কাছে গিয়ে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল—

"হে গদাধর! আমরা আর্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে আপনার চরণাশ্রিত হয়েছি। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনার মতো রক্ষা কর্তা থাকতেও আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়েছে। যে কথা বলে আমরা আপনার স্তুতি

করি, বলুন সেই একই কথা বলে কি করে দৈত্যরাজ বলির স্তুতি করব? প্রভু! আমরা কায়মনবাক্যে আপনারই শরণ নিয়েছি। তাই আপনার চরণাশ্রিত আমরা ঐ দৈত্যপতিকে কেমন করে নমস্কার নিবেদন করব?' হে অচ্যুত! আমরা মহাযজ্ঞ করে আপনারই অর্চনা করি, উদার বাক্যে আপনারই স্তব করি: সেই আপনার চরণাশ্রিত আমরা কি করে দৈত্যকে নমস্কার করবো। আপনি ব্রহ্মা রূপে স্রষ্টা, বিষ্ণু রূপে পালয়িতা ও রুদ্র রূপে সংহার কর্তা। আমরা আপনাকে ভিন্ন ঐ দৈত্যকে কেমন করে প্রণাম করবো? জগতে যখন ঐশ্বর্য লাভই কাম্য, তখন বিনা ঐশ্বর্যে ফল কি? আমরা ইতেশ্বর্য হয়ে দৈত্য বলিকে কেমন করে প্রণাম নিবেদন করবো?" তারপর দেবতারা আরও গদগদ হয়ে বললো, "হে জগদ্বিধাতা! তুমি অনাদি—তুমি অনন্ত—তুমি চরাচর গুরু। প্রভু! তুমি থাকতে আমরা ঐ মরণশীল দৈত্যরাজকে কি ভাবে আমাদের রক্ষক ভাবতে পারি? তুমি থাকতে আমরা কেমন করে তাকে প্রণাম জানাতে পারি?"

দেবতাদের কথা শুনে বিষ্ণু নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "দেবগণ! দৈত্য বলি আমার পরমভক্ত, সুতরাং তোমাদের অবধ্য। তোমরা যেমন আমার প্রতিপাল্য, সেও তাই-ই। সুতরাং তাকে বধ করি এ আমার অভিপ্রায় নয়। তাই যুদ্ধ না করে ছলনার আশ্রয়ে বলিকে পরাস্ত করে রাজ্যচ্যুত করতে হবে।"—এই কথা বলে বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বস্ত করলেন এবং শীঘ্রই বামন রূপ গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। দেবসমাজে উৎসব পড়ে গেল।

তারপর একদিন মর্ত্যে দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলো। যজ্ঞে দৈত্যগুরু পরম বেদবিদ শুক্রাচার্য পুরোহিতের কার্যভার গ্রহণ করলেন। বলির মহাযজ্ঞ আরম্ভ হলো। হবির্ভাগ গ্রহণ করতে দেবতা, গন্ধর্ব, পন্নগ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হলো। চারিদিকে 'দীয়তাম্,' 'ভুজ্যতাম্' প্রভৃতি ধ্বনি ভরে গেল তাছাড়া উচ্চারিত হতে লাগল 'পূর্ণ' ও "পরিপূর্ণ" এই দুটি কথা।

যখন মহা সমারোহের সঙ্গে বলির যজ্ঞ চলছে তখন বামনদেব চিত্রকুণ্ডলে

মণ্ডিত হয়ে বিপ্রের বেশ ধারণ করে সামগান করতে করতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। শুক্রাচার্য বামনদেবকে দেখে বুঝতে পারলেন যে তিনি অবতার রূপে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু—যজ্ঞ বা তপস্যার ফলদাতা। দৈত্যচার্য বামনদেবকে দেখিয়ে বলিকে বললেন, "রাজা! ঐ যে অদূরে বামন বিপ্রকে দেখছো, ওঁকে তুমি সামান্য নর বলে বিবেচনা করো না, উনি বামনরূপে ভগবান বিষ্ণু। ওঁকে উপযুক্ত দান দ্বারা সন্তুষ্ট কর।"

যজ্ঞে বামনরূপ ধরে স্বয়ং বিষ্ণু এসেছেন জেনে আনন্দিত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে দ্রুত বামন দেবের কাজে স্বস্ত্রীক গিয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে বলি বলল, "দেব! আপনার আগমনে আমরা ধন্য হয়েছি।" তার পর পাদ্য অর্ঘে বামনদেবকে পূজা করে সবিনয়ে জানাল, "অনুগ্রহ করে আপনার কি প্রার্থনা জানতে পারলে তা পূর্ণ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।"

বামনদেব ইষৎ হেসে বলিকে আশীর্বাদ করে বললেন, "দৈত্যেশ্বর! তোমার শান্তিপূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠান দেখে আমি তৃপ্ত হলাম। আমার প্রার্থনা খুবই সামান্য। আমি মাত্র তিন পদ পরিমাণ ভূমি চাই। এ ছাড়া আমার কিছুই প্রয়োজন নেই।"

বেশ, তাই দেবো। এ দেওয়া আমার কাছে কিছুই নয়।" এ কথা বলে বলি রত্ন খচিত কলস থেকে করতলে জল গ্রহণ করে দান প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হলো। বামনদেব অনুচ্চ স্বরে 'স্বস্তি' এই কথা উচ্চারণ করে বললেন, "রাজা! তুমি সুখী হও—শান্তি লাভ কর। আমাকে ত্রি-পাদ পরিমিত ভূমিই দান কর। আমি এখনই এই দান গ্রহণ করে ফিরে যাব।"—

দৈত্যপতি 'তথাস্তু' বলে যখন বামনদেবের দিকে তাকাল তখন অবাক হয়ে দেখল যে বিপ্র বিরাট আকার ধারণ করেছেন। তাঁর তিনটি পদ। তাঁর দিকে চেয়ে অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে দৈত্যরাজ বলে ওঠে, "হে জগন্ময়! আপনি যতদূর ইচ্ছা পদ বিক্ষেপ করুন। আমি সর্বতো ভাবেই আপনার আকাঙ্খা পূর্ণ করব।"

বামনদেব হেসে বললেন, "এই দেখ আমি পদ বিক্ষেপ করছি"; এ কথা

বলে তিনি তাঁর এক পদ দিয়ে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছাদন করলেন। দ্বিতীয় পদ উপনীত হলো সনাতন ব্রহ্মলোক।" তারপর তিনি বললেন, "দৈত্য-পতি বলি! আমার তৃতীয় চরণ এখন কোথায় রাখব বলো? তার স্থান কোথায়?"

বলি বলল, "প্রভু! আমি তো এ জগৎ সৃষ্টি করি নি। আপনিই তো জগতের স্রষ্টা। পৃথিবী যদি ক্ষুদ্র হয়ে থাকে তবে তা আপনার সৃষ্টি দোষেই হয়েছে। কিন্তু আমি আমার শপথ পূর্ণ করবো। আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন।"

বামনরূপী বিষ্ণু বললেন, "বলি! তোমার ঐকান্তিক ভক্তি দেখে আমি তুষ্ট হলাম। তুমি বর প্রার্থনা করো।" বলি বলল, আমার কোনো প্রার্থনা নেই।"

"বেশ, তবে আমিই তোমাকে বর দান কবছি।" বামনদেব বললেন, "তুমি রসাতলে চলে গিয়ে বসবাস করতে থাক। সেখানে গিয়ে তুমি অধিশ্বর হবে এবং ভবিষ্যতে ইন্দ্রত্বও লাভ করবে। আমি তোমার দ্বাররক্ষক হয়ে থাকব।" তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনরায় বললেন, "আমার বরে আত্মার উপর তোমার অধিপত্য থাকবে এবং তুমি অবিনশ্বর যশ লাভ করবে।"

বামনাবতারের নির্দেশে ভক্ত বলি রাজা সুবোধ বালকের মতো পরিবার পরিজন ও প্রজাদের নিয়ে পাতাল দেশে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করে বসবাস করতে লাগল। এদিকে বামনদেবের উর্ধ্বমুখী দ্বিতীয় পদটি ব্রহ্মলোকে গেলে ব্রহ্মলোকে গেলে ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ঢেলে সেই পদ ধুয়ে দিলেন। পুণ্যবাহিনী হয়ে গঙ্গা ধরাতলে অবতীর্ণ হলেন।

বামনাবতার কাহিনী ও ধরণীতে গঙ্গাবতরণের অন্য উপাখ্যান ব্রহ্মপুরাণে এইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই কাহিনীর নায়ক দৈত্যরাজ বলি কেবল মাত্র সত্যনিষ্ঠ স্বধর্মনিরত বিশ্বজয়ী দানবীর বলে উল্লেখিত হয়েছে অথচ বামন পুরাণে বলিকে হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র অর্থাৎ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের আত্মজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই দৈত্য বংশে তিন প্রতাপশালী দৈত্যকে উৎখাত করতে ভগবান বিষ্ণু তিন তিনবার অবতার রূপ গ্রহণ করে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছেন দুজন দৈত্য যারা তাঁরই সৃষ্ট জীব তিনি তাদের সংহার করেছেন তার অত্যাচারী হয়ে জগতের শান্তি নাশ করছিল বলে। তৃতীয় দেবশত্র বলি ছিল সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক। বিষ্ণু বামনাবতার হয়ে তাকে নিধন না করে ছলনায় বশীভূত করে পাতালে নির্বাসন দিলেন। ঈশ্বরের অবতার কেন এমন কাজ করলেন? কারণ আর কিছুই নয়, হিংসার বিষে জর্জর দেবতাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ভগবান নিরপরাধ বলিকে শাস্তি দিলেন। বলির কি অপরাধ ছিল? কিছুমাত্র না। সে ছিল ধার্মিক, বিনয়ী অথচ প্রতাপশালী—জীবনকে বিকশিত করতে আগ্রহী। শাস্তির কারণ স্বরূপ বলা হলো যে তার আত্ম-অহমিকার জন্য ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছেন অথচ দেবতাদের জঘন্য হিংসার জন্য তারা তিরস্কারও পেল না। আরও কৌতুকের ব্যাপার যে বলি সেখানে ইন্দ্রত্ব লাভ করেও হেলায় ত্যাগ করছে সেখানে ভগবান তাকে বরদান করছেন যে সে ইন্দ্রত্ব লাভ করবে। একে পুরাণকারের স্থূল-কল্পনা ছাড়া আর কি বলা যায়!

বলি-উপাখ্যান কি আর্য-অনার্য বিরোধকে কেন্দ্র করে কোনো কল্পিত কাহিনী? কাহিনী কল্পিত হলেও কত না দুর্বল ও বিসদৃশ। এখানে দেখান হলো যে ঈশ্বর অবতাররূপ ধারণ করে হিংসাশ্রয়ী মৎসর্য পরায়ণ দেবতাদের তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন উদার চরিত্র পরম ধার্মিক বলি রাজাকে হতশ্রী করে তাকে পাতালে নির্বাসন দিলেন। এ ঘটনা কি অপরাধ মূলক নয়? তাই বামনাবতার বৃত্তান্তকে যদি স্বার্থান্বেষীর স্থূল কল্পনা বলে ধরা হয় তবে হয়ত তা অযৌক্তিক নাও হতে পারে। আর এ কাহিনী যদি রূপক কাহিনী হয় তবে তার উদ্দেশ্য বিষ্ণু মাহাত্ম্য প্রচার হলেও নিঃসন্দেহে এটি নিম্নমানের উপস্থাপনা।

ঋগ্বেদে দেখা যায় বৈদিক আর্যদের মধ্যে ইন্দ্রদেবতারই প্রাধান্য বেশী ছিল। রুদ্র দেবতার ধারণাও সেখানে বেশ পরিস্ফুট। কিন্তু ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর উল্লেখ তেমন নেই। বিষ্ণু দেবতার কথা যদিও স্থানে স্থানে বলা হয়েছে—

অর্থাৎ বিষ্ণুর ধারণা করা হয়েছে কিন্তু সেটি পৌরাণিক বিষ্ণু ভাবনার মতো নয়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু-ধারণা দানা বাঁধেনি এবং সেখানে বিষ্ণু অর্থে সম্ভবত সূর্য দেবতাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ঋষি তাঁর সূক্তে সূর্যের তিন ভুবন পরিক্রমার কথা বলেছেন। সম্ভবত ঋষির এই ধারণাই পৌরাণিক যুগে বামনাবতার উপাখ্যানের মধ্যে পল্লবিত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—বিশ্বচরাচরের এই তিন অভিব্যক্তি। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা; বিষ্ণু জগৎ পালক বা স্থিতির দেবতা ও রুদ্র হলেন সংহারের অধিকর্তা। কিন্তু একই মহান ঈশ্বরের এই তিন ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তিন রূপই গতিবেগের স্রোতে এক—একই তিন। ঋষিরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে মৈত্রেয় ঋষির জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি পরাশর বলেছিলেন জগৎ বিষ্ণু হতে উৎপন্ন, বিষ্ণুতেই তার অবস্থিতি এবং বিষ্ণুই স্থিতি ও সংযমের কর্তা। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অভিন্ন।

এই বিষ্ণু-ভাবনা পৌরাণিক যুগেব ফসল। ঋগ্বেদে বিষ্ণুদেবতার কথা ঋষির সূক্তে তেমন প্রাধান্য পায়নি। বিষ্ণু সেখানে অপ্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের বিষ্ণু বন্দনা যা সূক্তে সঙ্কলিত আছে সেগুলির মধ্যে দীর্ঘতমা ঋষির বিষ্ণু বন্দনা তাৎপর্যপূর্ণ, দীর্ঘতমা বলেছেন, "বিষ্ণু এই জগৎ পরিমাপ করেছেন, যাঁর ত্রিবিক্রম পদক্ষেপের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের স্থিতি। বিষ্ণু তিন ভুবনকে ধরে আছেন। তাঁর অমৃত ধারায় প্লাবিত তিন ভুবন। তাঁর পরম পদই সেই অমৃতধারার উৎস। মানুষ জানতে পারে তাঁর দুই পদের ঠিকানা কিন্তু তাঁর তৃতীয় পদ কেউ অতিক্রম করতে পারে না। আকাশচারী পাখীরাও পায়না তাঁর তৃতীয় পদের সন্ধান। [ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৬]

সম্ভবত বেদের ঋষি 'বিষ্ণু' বলতে সূর্যকেই বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো ঋষির ধারণায় বিষ্ণু তাঁর ৯০ টি অশ্বকে (দিন কে) গতি দান করেন। তাদের চার নাম দিয়ে চারটি ঋতু সৃষ্টি করেন এবং ৩৬০ দিনে এক বছর পরিমাপ করেন। বরুণ ও অশ্বিনীকুমাররা মরুৎ পরিচালক বিষ্ণুর আজ্ঞা

মানেন। বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর, তিনি যজমানকে যজ্ঞ ফল অর্পণ করেন। তবু বিবিধ গুণে গুণান্বিত হলেও বেদে বিষ্ণু উপেন্দ্র হিসাবেই গণ্য হয়েছেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের সূক্তে আছে যে বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ বলির আয়োজন করেছিলেন। ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯তম সূক্তে ভরদ্বাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে যুগপৎ স্তুতি করেছেন। মহর্ষি তাঁদের উভয়কে 'মদপতি' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা মতো এই দুই দেবতা অন্তরীক্ষ বিস্তৃত করেন এবং মানুষের জীবন ধারণের জন্য দেশকে প্রসারিত করেন। ভরদ্বাজের এই সূক্ত থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে সম্ভবত ইন্দ্রও বিষ্ণু আর্যদের দুই মহান নেতা ছিলেন। দিগ্বিজয় করে তাঁরা আর্যদের দুর্গম গিরিপথ পার করিয়ে ভারতবর্ষে এনেছিলেন। হয়ত সেই কথা স্মরণ করেই তাঁদের বিজয় গাথা রচিত হয়েছিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ আরও বলেছেন যে ইন্দ্রও বিষ্ণু চিরবিজয়ী। কেউ তাঁদের পরাজিত করতে পারেনি। তাঁরা প্রচণ্ড শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ করে বিস্তৃত পৃথিবীকে আর্য ভূমিতে পরিণত করেছেন।

তারপর দেখা গেল ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুই প্রধানতম দেবতা হয়ে উঠলেন। ইন্দ্রের গৌরবকে ম্লান করলেন তিনি। সেটা ঋগ্বেদের যুগ নয়; সে যুগের দেবতা মণ্ডল যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন। বিষ্ণুর প্রাধান্য ব্রাহ্মণের যুগের শুরুতে এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এর পরিণতি লাভ। বিষ্ণু সম্পর্কে ঐতেরেয় ব্রাহ্মণের এইরূপ উল্লেখ আছে—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণু : পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্য দেবা : [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১]

অগ্নি দেবতাদের প্রথম, বিষ্ণু দেবতাদের পরম এবং দেবতাদের অবস্থিতি মধ্য-ভাগে। শতপথ ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে দেবগণ যজ্ঞ করলেন, স্থির হলো যে তপস্যার বিস্তৃতিতে যিনি সর্বপ্রথম যজ্ঞফল লাভ করবেন তিনিই নেতা হবেন। বিষ্ণু তাঁর অপূর্ব বিভূতির প্রভাবে পরম সিদ্ধিলাভ করে দেবতাদের মধ্যে প্রধান হলেন।

বিষ্ণুর এই অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিই বামন অবতার কাহিনীর মূল।

সুরাসুরের যুদ্ধে বামনদেব (বিষ্ণুর অবতার রূপ) অসুরদের কাছ থেকে মাত্র ত্রি-পাদ ভূমি চাইলেন ; পরে সেই ত্রি-পাদ সংক্রমণে সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করলেন। এই ত্রিবিক্রম কথার রূপক কাহিনী কিন্তু ঋগ্বেদের ভাব অবলম্বন করেই পল্লবিত হয়েছে।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—"যে মানুষ বিবেককে সারথি করে চলে, যে মনন শক্তিরূপ বল্গাকে শাসনে রাখে, সেই মানুষ পথের পরিসমাপ্তি পায়। সেই-ই লাভ করে বিষ্ণুর পরম পদ যা মানুষের পরম পাওয়া—তার অভীপ্সার শেষ সীমা।"

বিষ্ণুর দুই পদ দৃশ্য কিন্তু তাঁর তৃতীয় পদ অদৃশ্য যা মানুষের ধারণায় তার চাওয়া-পাওয়ার পরম স্থান। এই ভাবে পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য প্রচারের মাধ্যমে মানুষ তার মুক্তি বা চরম-অভ্যুদয় বলতে এই অদৃশ্য, অজ্ঞাত তৃতীয় পদকে বুঝতে শিখল। আর সেই দিন থেকেই বুঝি বিষ্ণু হিন্দুর পরম দেবতা হলেন।

ঋগ্বেদের সূত্র ধরে বলা যায় যে বামনাবতারের কাহিনী কল্পিত—বিষ্ণু মাহাত্ম্য ও তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রচারের জন্য একটি গল্পের সৃষ্টি করা হয়েছে যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভগবানের মহান উদারতা এখানে ম্লান হয়েছে। বিষ্ণুর বামনাবতার রূপের পূর্ববর্তী চার অবতারের কাহিনী পরবর্তী যুগগুলিতে কল্পিত হয়েছে অর্থাৎ সত্য যুগে আবির্ভূত অবতার কাহিনী সে যুগেই লেখা হয়েছে না এসব পরবর্তী যুগের প্রয়াস সে কথা জানা নেই ; তবে ঐ পৌরাণিক যুগগুলিতে যে বিষ্ণুর প্রাধান্য ছিল তা অনুমান করা যায়।

মানুষের বোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসন্ধিৎসু মন জগৎ জীবনের রহস্য খুঁজতে তৎপর হয়েছে। ক্রমে তার সাধনায় ঈশ্বর উপলব্ধি ঘটেছে। মানুষ তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরেছে তার ধ্যান ও সাধনার-দ্বারা ; কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছে সে উত্তর—পেয়েছে পরম পথের ঠিকানা এবং অপরের জন্য আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আন্তর উপলব্ধির আলো রেখে গেছে তার সামর্থ মতো। ঈশ্বর অনুসন্ধানের পথে মানুষ

তার ধারণার দিগন্তকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে কল্পনা করেছে। সাধক নিরাকার ঈশ্বরকে উপলব্ধি করলেও সাধারণের বোধ বিকাশের জন্য সাকার দেব-দেবীর কল্পনা করে উপাসানা করেছে কিন্তু তার সে কল্পনা শুধু কল্পনাই হয়ে থাকেনি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে সত্যের জ্যোতির্ময় আলোয়। ঈশ্বরের সাকার রূপের ধ্যান করেও মানুষের পরম প্রাপ্তি বা ঈশ্বর লাভ হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধনার ত্রুটি তার ফলসিদ্ধির অন্তরায় হয়ে তার মুক্তির পথ রুদ্ধ করে তুলেছে—তাকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে তমসাচ্ছন্ন করেছে। তখন ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থগন্ধী মানুষ বিভিন্ন দেব দেবীকে নিয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় গড়েছে ও হিন্দুর ধর্ম ভাবনার জাহ্নবী জলে জমেছে ক্লেদ। তাই ভগবানের অবতার কল্পনার মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বীজ যা স্বার্থের পূতি-গন্ধে ক্লেদাক্ত। সে কারণে মনে হয় অবতার তত্ত্বের ধারণার মধ্যে হয়ত অনেক ফাঁকি রয়ে গেছে। দেব দেবীর কল্পিত রূপ ধ্যান করে মানুষ যেমন ঈশ্বরকেই পেয়েছে, তেমন ভাবেই কি প্রথম পঞ্চ অবতার গণের ধ্যান তাকে সত্যের আলোয় আলোকিত করতে পেরেছে, না কেবল মানুষের সংস্কারকেই জাগিয়েছে? মনে হয় অবতার ভাবনার মাধ্যমে ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরুরা যে সত্য উপলব্ধি করে ছিলেন তা স্বার্থের ঘূর্ণিপাকে ও প্রতিষ্ঠার লোভে মসী লিপ্ত হয়েছে। তারপর উপলব্ধির গভীরতায় গিয়ে পরবর্তী কালে তাঁরা আর অন্য জীব বা বিসদৃশ মূর্তি কল্পনা না করে ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের অংশাবতার রূপে কল্পনা করেছেন। ঐ মহা-পুরুষরাই ঈশ্বর রূপে জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবতার বাদ যে উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এর যে ক্রম-বিকাশ ঘটেছিল তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

৮

আমরা পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করলে অনুমান করতে পারি যে বিষ্ণুর অবতার-রূপে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা অথবা ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন এই পাঁচ অবতারের কল্পনা করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে অবতার তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং উপরের পাঁচ অবতারকে ঈশ্বরের পূর্ণ অবতাররূপে ধারণা করা হয়েছে। এই যুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ধর্ম নেতা ও পণ্ডিতবর্গের ধারণায় অন্য যে পাঁচ অবতারের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কিন্তু সকলেই মরণশীল মানুষ এবং পৃথিবীর বুকেই মাতৃজঠরে জন্ম নিয়েছেন। এই পাঁচ অবতার পুরুষের মধ্যে চারজনই ইতিহাসের বিখ্যাত মানুষ—আলোক সামান্য প্রতিভাধর —অতিমানস সত্তা। এঁদের অতুলনীয় কীর্তি ও কর্ম বৈশিষ্ট্যের জন্য এঁরা মহান হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে দাশরথি রাম, বাসুদেব কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ মানুষকে সত্য-পথের দিশা দেখিয়েছেন জীবনে সত্য-সাধনার তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে। সবই হয়তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। জন্ম জন্মের তপস্যার মধ্য দিয়ে এঁরা মুক্তির পথে আলোকবর্তিকা নিয়ে এসেছেন। তাই হয়তো তাঁরা ঈশ্বরের অবতাররূপে গণ্য হয়েছেন। ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী তাঁরা ঈশ্বরে একীভূত হয়ে ঈশ্বরেরই বিভূতি-সম্পন্ন হয়েছেন। তাই ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা এঁদের যে বিষ্ণুর অংশাবতার বলেছেন তা কল্পনা হলেও যেন আপন অজ্ঞাতেই সত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যাঁদের অবতার পুরুষ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাঁরা জগৎ ও জীবের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করেছেন তা সবই তাঁদের আপন চরিত্র-গরিমায় সমুজ্জ্বল যা ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি এবং জগতের বিকাশ

লাভের প্রয়োজনে (অর্থাৎ ভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য) ভগবানের ইচ্ছায় সম্পন্ন। মহান আদর্শের অনুবর্তী হয়ে তাঁরা যুগে যুগে মানব মুক্তির দিশারী হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছেন।

হিন্দুর যে ধর্মসম্প্রদায় পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বলরাম ও বুদ্ধদেবকে 'অবতার' হিসাবে আখ্যাত করেছে তাদের কল্পনার মূলে যে বিশ্বাস বা উপলব্ধিই থেকে থাকুন না কেন অথবা সে সব যে অভিপ্রায় প্রসূতই হোক না কেন, সু-সামঞ্জস্য ভাবে ব্যাখ্যাত হলে দেখা যাবে সে কল্পনা একেবারে ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এই উপলব্ধির পথ বেয়েই বহুকাল পর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণকেও ঈশ্বরের 'অবতার' বলা হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই উপলব্ধি-সঞ্জাত 'অবতার' হলেন যীশু-খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি মহামানবগণ, যদিও তাঁরা ঈশ্বরের অবতার হিসাবে আখ্যাত হননি। এঁদের পথ ও মত ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল এক —মানবাত্মার বিকাশের জন্য পথ নির্দেশ, যে মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশীভূত সত্তা।

অবশ্য এই 'অবতার' ধারণা বহু জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মন এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। তার কুফল স্বরূপ প্রথমেই বলা যায় যে এই চিন্তাধারা স্বার্থের পঙ্কে নিমজ্জিত ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুদের অনেক নীচে নামিয়েছে। স্বার্থান্বেষী ধর্ম-নেতারা বা ধর্ম গুরুর চেলারা আপন আপন সুবিধা মতো যাঁকে ইচ্ছা করেছে তাঁকেই 'অবতার' বলে প্রচার করেছে। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অবতারগণের উপাসনা করে (যেমন রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি) মানুষ মোক্ষ লাভও করেছে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরামের জীবন-কাহিনী-কল্পনা কিম্বদন্তীর মায়াজাল সরিয়ে কেমন ছিল তা দেখা যাক।

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের পরিচয় ও কর্মকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ভার্গব বংশীয় প্রথিতযশা ঋষি জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র, তাঁর নাম ছিল রাম। জমদগ্নি প্রতিভাসম্পন্ন ঋষি

ছিলেন। তাঁর পিতা মহর্ষি ঋচীক ও পিতামহ বিখ্যাত মানুষ মহর্ষি ভৃগু। ঋগ্বেদে জমদগ্নি ঋষির রচিত সূক্ত সঙ্কলিত আছে। তিনি একাধারে পরম বেদবিদ, প্রকৃষ্ট রণনিপুণ যোদ্ধা ও ধনবান গৃহস্থ ঋষি ছিলেন। সেকালে বৈদিক সমাজে ঋষি জমদগ্নি খুব প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল ; তাঁদের নাম রুমন্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও রাম। রাম সর্ব কনিষ্ঠ হলেও সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও অকুতোভয় ছিলেন। জমদাগ্নির স্ত্রী রাজ-বালা রেণুকা। অনেকের মতে রেণুকা রেণু ঋষির কন্যা ছিলেন। জমদগ্নি সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রাম অত্যন্ত বেপরোয়া ধরনের মানুষ ছিলেন। অসম্ভব শক্তিশালী, ক্রোধী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ধী-শক্তিও ছিল তাঁর অসাধারণ। বেদ চর্চার চেয়ে শাস্ত্র-চর্চাতেই তাঁর অধিক আসক্তি ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাঁর প্রিয় অস্ত্র ছিল 'কুঠার' বা পরশু। তাঁর হাতে ধরা থাকত এই অস্ত্র, তাই 'পরশুরাম' নামে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন।

জীবনের প্রথমেই মাতৃশোণিতে পরশুরামের হাত কলঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হলো এই রকম—

পত্নী রেণুকা চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব রাজার প্রতি মানসিক ভাবে আসক্তা হয়েছেন একবার জমদগ্নির এমন সন্দেহ হয়। সে কারণে ঋষি তাঁর পত্নীর প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠেন এবং পুত্রদের একে একে তাদের মাতাকে হত্যা করতে আদেশ দেন কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র রাম ছাড়া অন্য পুত্ররা এ কাজ করতে অস্বীকার করলে জমদগ্নি তাদের অভিশাপ দেন। শেষে রাম পিতৃ আজ্ঞা পালন করে মাতাকে হত্যা করলে ঋষি তাঁর পিতৃভক্ত পুত্রকে আশীর্বাদ করে বর দিতে চাইলে পুত্র জানায়, "পিতা! আমাকে দুটি বর দিন। আমার ইচ্ছা প্রথম বরে আমার মা পুনরায় জীবনলাভ করুন আর দ্বিতীয় বরে আমার মাতৃ হত্যার পাপ দূর হোক।"

জমদগ্নি পুত্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তথাস্তু।" ঋষির বরে রেণুকা পুনরায় জীবন ফিরে পান আর সেই সঙ্গে পরশুরামের মাতৃহত্যাজনিত পাপ দূর হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন এসব কি সত্যই ঘটেছিল সেদিন? পিতৃ আজ্ঞায় পিতৃভক্ত পুত্র ক্রোধবশে জননীকে হত্যা করলেন এবং খুসী হয়ে পিতা তাঁকে বর দিলেন। পিতার আশীর্বাদে হত্যাকারী পুত্রের মাতৃ-বধজনিত পাপ দূর হয়ে গেল। এমন বর্বরোচিত আচরণ সুসভ্য বৈদিক যুগে ঘটেছিল? এ কাহিনী কি কোনো সভ্য মানব সমাজের কাহিনী? না, এমন বর্বর কাহিনী কোনো মহান ঋষিকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে তবে তা নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনিত ঘটনা। এ ছাড়া ঋষি পত্নীর বেঁচে ওঠার ব্যাপারটিও অস্বাভাবিক। রেণুকারই বা কি এমন অপরাধ হয়েছিল? ঘটনা যদি এমন ঘটেই থাকে এবং উগ্রস্বভাব পরশুরাম যদি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর জননীকে অস্ত্রাঘাত করে থাকেন এবং যদি সেই আঘাতে রেণুকার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে ঘটনা নিন্দনীয় হলেও স্বাভাবিক। কিন্তু এর পর অন্য যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে সে সব সম্ভবত পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত রচনা। পরশুরামের দোষ ঢাকার জন্য ও তাঁকে মহান প্রতিপন্ন করার জন্যই এগুলির উদ্ভব হয়েছে মনে হয়। ধরা যাক যে রেণুকা পরপুরুষে আসক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কতখানি ছিল তাঁর আসক্তি? সে আসক্তি কি কেবল মানসিক ছিল না শরীর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল? মহাভারতে এ সম্পর্কে সে রকম বর্ণনা আছে তাতে জানা যায় রাজা চিত্ররথকে রমণীপরিবৃত হয়ে নদীতে স্নান করতে দেখে রেণুকা কাম-বিহ্বলা হয়েছিলেন। ঘটনা যদি এমন হয় তবে ঋষি পত্নীর কতটুকু দোষ তা বিচার্য। পত্নীকে কায়মনবাক্যে পতিপরায়ণা হতে হবে এ ছিল প্রাচীন কালের সামাজিক অনুশাসন। তার পরিপ্রেক্ষিতে রেণুকার পর-পুরুষ দর্শনে কাম-চঞ্চলা হওয়া দোষের, কিন্তু রক্ত-মাংসের নর-নারীর পক্ষে এরকম ব্যাপার ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্য লঘু পাপে গুরু দণ্ড? পত্নী হত্যা? মাতৃবধ? নারীর প্রতি পুরুষ শাসিত সমাজের এ এক অন্যায় নির্দয়তা নয়কি যা আবাহমান কাল ধরে চলে আসছে? এক-জন পুরুষ নিজের পত্নী ছাড়া অন্য নারীকে দেখে মুগ্ধ হতে পারে, তাকে (নারীটিকে) তার ভালো লেগে যেতে পারে; তেমনি একজন অবিবাহিতা

বা বিবাহিতা নারীরও অপর পুরুষকে দেখে ভালো লাগতে পারে(সমাজের কঠিন অনুশাসন থাকলেও মন অনেক সময় মানুষের আয়ত্তে থাকে না) আর ভালো লাগার নারী বা পুরুষ সম্পর্কে যে কোনো পুরুষ বা নারী—প্রেম বা কামজনিত নানা রকম কল্পনাও করতে পারে। মনের এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বা দোষবহ বলা যায় না। আর এর দ্বারা সমাজও ভেঙে পড়ে না। মনের গোপন খবর অন্য কেই বা জানতে পারে—আব-ভাবে যতটুকু অনুমান করা যায়, তার বেশী আর নয়। জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা যদি এই রকম 'ভাল লাগার' অপরাধে অপরাধী হন তবে তাঁকে হত্যা করা কি খুব ন্যায় সঙ্গত কাজ হয়েছিল ? মহর্ষি জমদগ্নির দ্বারা এমন নির্দয়তা সমর্থন যোগ্য নয়। এহেন নারীর প্রতি ক্ষমতাগর্বী পুরুষের অত্যাচারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জমদগ্নির পক্ষে এমন আচরণ বিসদৃশ ব্যাপার।

আবার রেণুকার পুনরায় জীবনলাভ যদি পরবর্তীকালের কল্পনা না হয় তবে অনুমান করা যেতে পারে যে হয়ত পুত্রের অস্ত্রাঘাতে তিনি প্রচণ্ড-ভাবে আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর সেরকম কিছু না হলে মৃতা রেণুকার পুনর্জীবন লাভ অবিশ্বাস্য ঘটনা তা ঋষি জমদগ্নির যতই অসীম শক্তি থাকুক না কেন। তাছাড়া অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্থিতধী ঋষি-পত্নীর অন্যায় আচরণে ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে পুত্রকে দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করাবেন এমন ব্যাপার ভাবা যায় না। অন্য ক্ষেত্রে ঘটনাটি যদি সত্যই হয়ে থাকে তবে যিনি ঈশ্বরের অংশাবাতার বলে স্বীকৃত তিনি তাঁর জননীকে হত্যা করে ঈশ্বরোচিত কোনো কাজ করেছেন কি ? পরবর্তী কালে এই ঘটনার উপর যতই প্রলেপন পড়ুক আর পরশুরামকে যতই কেন মহান ঈশ্বরের অংশাবতার হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হোক, তাঁর হাত যে মাতৃ শোণিতে কলঙ্কিত হয়েছিল !

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যিনি ঈশ্বরের অবতার—তিনি যদি এমন ঘৃণ্য আচরণ করবেন তাহলে ঈশ্বরের গরিমা কোথায় থাকল ? তাই এই ঘটনা থেকেই ধারণা করা যায় যে উগ্র ব্রাহ্মণ ভার্গব পরশু-

রামকে যে 'অবতার' বলা হয়েছে তা বুঝি তাঁর দোষস্খালন করার জন্য তাঁর ওপর আরোপিত বা কল্পিত গুণ।

এরপরও দেখা যায় জামদগ্ন্য রাম ধীরে ধীরে হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার কঠিন সঙ্কল্পে। হৈহয় রাজ কীর্তিবীর্যের পুত্র কার্তবীর্যোর্জুনের সঙ্গে জমদগ্নি ঋষির বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। এই বিরোধ মুখ্যত বিষয় সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং একে কেন্দ্র করেই সে যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কে প্রধান তাই নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে প্রবল যুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শক্তিই জয়ী হয়েছিল পরশুরামের নেতৃত্বে।

রণকুশল জমদগ্নি ঋষির সঙ্গে রণনিপুণ হৈহয় রাজের দু'বার যুদ্ধ হয়; —একবার কার্তবীর্যার্জুন জেতেন অন্য রাজ্য জয় হয় জমদগ্নির। তারপর একদিন বৃদ্ধ ঋষিকে আশ্রমে একাকী অবস্থায় পেয়ে হৈহয় রাজপুত্ররা তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। পরশুরাম তখন আশ্রমে ছিলেন না, তিনি ফিরে এসে পিতার রক্তাপ্লুত মৃতদেহের দিকে চেয়ে রুদ্ধবাক শক্তি-ধর-প্রতিভাবান পুরুষ প্রতিজ্ঞা করেন।—

"আমি প্রচণ্ডভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব। আজ থেকে আমার এই-ই ধ্যান, এই-ই জ্ঞান।"

প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প পরশুরাম তারপর তাঁর সংগঠিত যুদ্ধ-বাহিনী নিয়ে হৈহয় রাজ্য আক্রমণ করেন ও কার্ত্যবীর্যার্জুন এবং তাঁর পুত্ররা নির্মমভাবে ভার্গবের হাতে নিহত হয়। পরশুরামের শাণিত কুঠার এর-পর ক্ষত্রিয়-শোণিত তৃষ্ণায় উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং তিনি সমগ্র দেশের সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করতে মেতে ওঠেন। কথিত আছে যে পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে জামদগ্ন্য-পরশুরাম একবিংশতিবার ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় বংশ নির্মূল করেছিলেন। সে সময় দেশে ক্ষত্রিয় পুরুষ না থাকায় ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভে নতুন ক্ষত্রিয় প্রজন্মের সৃষ্টি হয়ে-ছিল। পরশুরামের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধের প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে ভার্গবদের সঙ্গে হৈহয়দের যুদ্ধবিগ্রহকে কেন্দ্র করে যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়

সংগ্রাম বা ঋষি-রাজার যুদ্ধ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিশ্চিত-রূপে ছিল এক বিরাট রাষ্ট্র বিপ্লব ক্রমে যা সমাজ-বিপ্লবের রূপ নিয়েছিল। আর এর প্রধান হোতা ছিলেন ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংসী মহানায়ক পরশুরাম।

মহাশক্তিধর, দুর্জয়বীর, রণদুর্মদ, বলিষ্ঠমনা ও উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্পে যে যুদ্ধ তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে সে যুগের ভারতীয় ক্ষত্র সমাজ একেবারে ভেঙে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সেই চিতাভূমির উপরেই দেশের সামগ্রিক সমাজজীবনে নব বিকাশ ঘটেছিল নতুন প্রজন্মের জন্মের মধ্য দিয়ে। জাতীয় জীবন তার চলার পথে এক নতুন মোড় নিয়েছিল। এটাই পরোক্ষে পরশুরামের কৃতিত্ব।

তারপর ক্ষত্রিয় নিধন যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতে দিতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন তখন পাপস্খালনের জন্য নির্জনে তপস্যায় মগ্ন হলেন ও সত্য জ্ঞানলাভ করলেন। সম্ভবতঃ পরবর্তী-কালে মহাশক্তিধর এই পুরুষের কর্মকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার জন্য এবং তাঁর হত্যা-পরাধ ও হিংসাবৃত্তি অপনোদন করে তাঁকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ প্রতিপন্ন করার জন্য বিষ্ণু উপাসকগণ তাকে অবতাররূপে কল্পনা করে ঈশ্বরের অংশাবতার বলেছে। তাঁর ক্ষত্রিয় বিদ্বেষের সমর্থনে বলা হয়েছে যে পাপাচারী ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করার জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এমত স্বার্থ গন্ধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মনগড়া অভিমত। জামদগ্ন্য পরশুরামের যখন বৃদ্ধাবস্থা তখন দাশরথি রামচন্দ্র সবেমাত্র কৈশোর অতিক্রম করেছেন। বাল্মিকী রামায়ণ থেকে আমরা এ তথ্য পাই। সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় পরশুরাম রামচন্দ্রকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করেন কিন্তু রামের বলবীর্যের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন। তাঁর অমর মহাকাব্যে মহর্ষি বাল্মিকী এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

রামের বিক্রম দেখে পরশুরাম হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর

হঠাৎই নিজেকে হৃতবীর্য মনে হয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ রামচন্দ্রের দিকে চেয়ে থেকে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "রাম! তোমার কাছে আমি পরাজিত। এই মহাকোদণ্ডের আমি আর অধিকারী নই। তোমার অমোঘ বাণ আমার তপস্যালব্ধ দিব্য লোকের পথ আচ্ছন্ন করুক। আজ থেকে আমি রণ লিপ্সা ত্যাগ করে তপস্যা পরায়ণ হবার ব্রত গ্রহণ করলাম। তোমার মঙ্গল হোক।" এই কথা বলে পরশুরাম সেখান থেকে বিদায় নিয়ে মহেন্দ্র পর্বত অভিমুখে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন।

এতদিন যেন অশুভ সংহার তৃষ্ণা তাঁকে ভর করে ছিল। তিনি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। দাশরথি রামচন্দ্রের হাতে হৃতদর্প ও হৃতশক্তি হয়ে তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে চমকে ওঠেন। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার তাগিদে কেবল মানব রুধিরে সিক্ত হয়েছে তাঁর করপল্লব—পাষাণ হয়েছে হৃদয়—হারিয়ে গেছে ব্রাহ্মণত্ব। 'এতে কি লাভ হয়েছে? পিতৃপুরুষ তাঁর কি তৃপ্ত হয়েছেন? ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা কি বেড়েছে? রাষ্ট্রগুলির ওলট-পালট হয়েছে ঠিকই; ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে জন্মেছে নতুন প্রজন্ম। এই বিপ্লব কি আলোকিত করতে পারবে নতুন দিনের অভ্যুদয়কে? হিংসা ও হত্যা কি নিয়ে আসবে শান্তি ও আনন্দকে?'

পরশুরাম এই সব চিন্তা করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ছিলেন। তারপর ব্যাকুল চিত্তে সংসার ত্যাগ করে পার্বত্যপ্রদেশে গিয়ে তপস্যা করেন। সম্ভবতঃ এরপর তাঁর আত্মদর্শন ঘটেছিল।

পরশুরাম ও রামচন্দ্র দুজনই স্বনামধন্য মহাপুরুষ। তাঁরা সমসাময়িক বলা চলে। একই সময়ে তাঁদের জীবিত থাকা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু যদি মনে করা হয়, পুরাণকারেরা যেমন বলেছেন, যে, তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুর অংশাবতার তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা মনে জাগে যে একই সময়ে ভগবান বিষ্ণু দুই অংশে অবতার হয়ে বিরাজ করছেন এবং তাঁরা পরস্পর বিবাদ করছেন। ব্যাপারটা বড়ই বিসদৃশ ও উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর অন্য কিছু মনে হয় না। ঈশ্বর সম্পর্কে একটা

অলীক ধারণারই ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া তর্কের খাতিরেও যদি ধরা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের দুই অংশাবতার একই সময়ে আবির্ভূত হতে পারেন, তার প্রতিবাদে বলা যেতে পারে যে কেন অসীম শক্তিমান ঈশ্বরের একজন অংশাবতার কি একাই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন না? যাই হোক পুরাণ রচয়িতার এই অসঙ্গত কল্পনাই প্রমাণ করে যে পৌরাণিক যুগে ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃত্বে যে অবতারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ছিল তা স্থূল উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং এ সবই ছিল উদ্দেশ্য-মূলক। মনে হয় তাঁরা যুগন্ধর মহা-পুরুষদের নিয়ে কল্পনার তুলিকায় বিচিত্র সব গল্প রচনা করেছেন। কেবল মাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ কাজ। তবে এর ফলে সাধারণ সংস্কার বশে মানুষের মনে মহামানবদের কেউ কেউ অবতাররূপে প্রতিভাত হয়েছেন। হয়তো পরশুরাম সেইরূপ এক 'অবতার' পুরুষ।

৯

অযোধ্যার রাজা ইক্ষাকু বংশতিলক দশরথ পুত্র রামচন্দ্র নিঃসন্দেহে একজন সর্বগুণসম্পন্ন অতি উচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন। যাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি অনেক বেশী মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জীবিতকালেই অতুলনীয় কীর্তি ও মহৎ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য কল্পনা কিম্বদন্তী নিয়ে তিনি অলৌকিক পুরুষ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নারদের কাছে মহর্ষি বাল্মিকী জানতে চেয়েছিলেন তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয়, যাঁর পূত চরিত্র কথা তিনি তাঁর মহাকাব্যে ফুটিয়ে তুলবেন। নারদ তাঁকে বলেছিলেন যে দশরথ পুত্র রামই সে যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আদি কবি সঠিক যে কাহিনী লিখেছিলেন কালস্রোতে হয়তো তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে—মহা-কাব্য রামায়ণে অনেক সংযোজন বা বিয়োজন ঘটেছে। বর্তমান কালে যে রামায়ণ কাব্য প্রচলিত আছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে রামের জন্মের অনেক আগেই বাল্মীকি মুনি নাকি রামায়ণ রচনা করেন অথচ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি বর্তমান ছিলেন। পরবর্তীকালের নিছক কল্পনা বলে ধারণ হয় এই "রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখার কাহিনী।" দশম অবতার কল্কির সম্পর্কেও এ রকম কল্প-কাহিনী রচনা করা হয়েছে, পার্থক্য এই যে রামায়ণে হয়তো কিছু ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু কল্কি পুরাণের কাহিনীতে এ বস্তু অনুপস্থিত।

ধারণা করা হয়েছে যে রামচন্দ্র ও তাঁর তিন ভাই এঁরা সকলেই বিষ্ণুর অংশাবতার; রাম ঈশ্বরের অর্ধ ভাগ নিয়ে অবতার ও বাকি অর্ধ ভাগের মধ্যে মূলের এক চতুর্থাংশ নিয়ে লক্ষ্মণ ও এক অষ্টমাংশ করে ভরত ও শত্রুঘ্নের অবতারত্ব। হায় কল্পনা! ঈশ্বর নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কি বিচিত্র খেলা! ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে সমস্ত জীবই তো তাঁর অংশীভূত সত্তা।

রামায়ণ মহাকাব্যে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে রাম অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে যক্ষিণী তাড়কা এবং খর, দূষণ, রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসকে সংহার করে তাদের অত্যাচার থেকে জগতকে রক্ষা করেন ও জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ত্রেতা যুগে এইভাবে তিনি জগৎ উদ্ধার করেন। তিনি ঋষিদের তপস্যার নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরিয়ে দেন এবং সুষ্ঠুভাবে প্রজা পালন করে ন্যায় ও সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

রামায়ণ ধর্মকাব্য হলেও তার মধ্যে দেশ ও জাতির ইতিহাস আছে। রামায়ণে ঐতিহাসিক তথ্য যেটুকু পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি তৈরী করে এবং কিছু সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে রামচন্দ্র অযোধ্যা প্রদেশে সূর্যবংশীয় আর্যদের মধ্যে এক প্রতাপশালী, ধর্মপরায়ণ ন্যায়বান ও সত্যনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল দেশে তাঁর সমসাময়িক পরাক্রমী রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি ছিলেন অনার্য রাজা তাকে রাক্ষস বলে আখ্যাত করা হয়েছে। রাম ও রাবণের কলহ সম্ভবত আর্য-অনার্য বিরোধেরই চিত্র এবং আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী। রামচন্দ্র বানর জাতির (সম্ভবত এরা কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়) সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে অনার্য রাজা রাবণকে পরাজিত করেছিলেন। তাছাড়া দেশে কৃষি-বিস্তারও তাঁর এক বিশেষ কর্ম ছিল বলে ধারণা করা হয়। রঘুপতি রামের জনকল্যাণমূলক কাজ ও সত্য পরায়ণতার জন্যই জন-মানসে তিনি দেবতার আসন লাভ করেন।

রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি দশরথের চার পুত্রের জন্মের মধ্যে অলৌকিকত্ব আনা হলেও (পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও চরুভক্ষণের বৃত্তান্ত উল্লেখ্য) এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণু অবতার বলা হলেও ঐরূপ অর্থে রাম ঈশ্বরের অবতার নন। ভগবানের ইচ্ছায় রামচন্দ্রের মধ্যেই তাঁর বিভূতির প্রকাশ হয়েছিল অথবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে রাম তাঁর চরিত্র, কর্ম ও সাধনার দ্বারা গুণান্বিত হয়ে ঈশ্বরে একীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি ঈশ্বরের অবতার। অবতার বলতে যদি এ ব্যাপার বোঝায় তাহলে অবতার ধারণা একেবারে বাতিল হয় না।

মানুষের প্রাণের আসনে নবদুর্বাদল শ্যাম রঘুপতি রাম ঈশ্বর রূপেই বিরাজ করছেন। কালে কালে কত শত ভক্ত মানুষ 'রাম' নাম জপ করে, রাম মূর্তি ধ্যান করে পরমানন্দ লাভ করে মুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। ঈশ্বর আপনাকে বুঝি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ ভাবেই প্রকাশ করে চলেছেন। অপার মহিমা তাঁর।

তাহলে রামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অংশাবতার বলতে বাধা কোথায়?

হ্যাঁ, বাধা আছে, দ্বিধা আছে এর অলীকত্বের জন্যই। কেন মনে হয় পুরাণ-কারদের অবতার ভাবনা কেবলই কল্পনা? কারণ এর পশ্চাতে অন্তরালে রয়েছে স্বার্থের অন্ধকার ও দুরভিসন্ধির বক্রতা।

যদি ঈশ্বরের সৃষ্টির ভিতর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের মধ্যে তাঁর শক্তির সম্যক বিকাশ ঘটে; যদি ঈশ্বর কর্তৃক সেই অতিমানস সত্তা বিশেষ মঙ্গলজনক কর্মে নিয়োজিত হন এবং যদি এমন ক্ষণজন্মা মহামানবদের 'অবতার' আখ্যায় ভূষিত করা হয় তবে রামচন্দ্রও সে অর্থে 'অবতার'।

রঘুকুলতিলক রাজা রাম মানুষ। তিনি জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি নিয়ে জন্মেছিলেন এবং আপন চরিত্র প্রভায় জীবনকে উজ্জ্বল করে ঈশ্বরের অভিলাষ চরিতার্থ করে গেছেন জগতে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। রামচরিত্রে মানবোচিত কিছু দোষও রয়েছে দেখা যায়। গোপন স্থানে অবস্থান করে পশ্চাৎ থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বানর রাজা বালিকে হত্যা করা, ঈশ্বর সাধনায় রত অব্রাহ্মণ শূদ্রককে তপস্যা করার জন্য বধ করা, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য গর্ভবতী নিরপরাধ পত্নী জানকীকে বনে নির্বাসন দেওয়া—এ কার্যগুলি ন্যায় ও ধর্মসম্মত কাজ বলে প্রচার করা হলেও তা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। সত্যনিষ্ঠ রামের পক্ষে বালি বধ রাজ-নৈতিক ছলাকলা সম্মত হলেও ন্যায় ধর্ম সম্মত নয়। শূদ্রক হত্যা কেবল ব্রাহ্মণ্য শক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হয়নি কি? ঈশ্বরের করুণা সকলের প্রতি সমান; তাঁকে লাভ করার জন্য তাঁর সৃষ্ট যে কোনো মানুষ তাঁকে ডাকতে পারে—তাঁর আরাধনা করতে পারে; এখানে অধিকারের প্রশ্ন নেই। ঈশ্বর জাতিভেদ বা বর্ণভেদ সৃষ্টি করেননি; এসব করছে স্বার্থ-

গন্ধী ক্ষমতালোভী মানুষেরা। রামচন্দ্রের ঐ সকল কর্মের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় রূপ বা নিরপেক্ষ মনোভাবের আভাষ নেই—নেই উদারতার স্নিগ্ধতা ও বিকশোন্মুখ আলোকের প্রভা। এগুলি ঈশ্বরের কাজ ভাবতে গেলে দুঃখই পেতে হয়।

তাঁর মহৎ কার্যাবলী ও সুমহান চরিত্রের জন্য রামচন্দ্র পরবর্তী যুগে ঈশ্বরের অবতার রূপে কল্পিত হয়েছেন বলে অনুমিত হয়। এই কল্পনা ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বার্থেই হয়ত করা হয়েছিল অথবা কাল পরম্পরায় আলোক দিশারী মহামানব জনমানসে তাঁর গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসার অর্ঘ্য নিয়ে দেবতা হয়ে আসীন হয়েছেন।

মহামানবের মধ্যে ঈশ্বরের গুণবিকাশ প্রকৃষ্ট ভাবে হয় বলেই হয়ত পুরাণ-কারের কল্পনা একদিক দিয়ে সত্য হয়ে উঠেছে। রামচন্দ্র আজ জনমনে মনুষ্য শরীরে ঈশ্বরের অবতার। সত্য সত্যই মানুষ রাম-উপাসনায় পর-মানন্দ লাভ করে মুক্তি পাচ্ছে। মহর্ষি বাল্মিকী যে সত্যসন্ধ, মহাব্রতী, পিতৃভক্ত, প্রজাবৎসল, মানব প্রেমিক রামের চরিত-কথা লিখেছেন, পরবর্তী কালে ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তরা সেই মহোত্তম আদর্শ গ্রহণ করেনি। তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য রামকে ঈশ্বরের অংশাবতার রূপে কল্পনা করে ও জনমনকে বিষ্ণু দেবতার দিকে আকৃষ্ট করে দল ভারি করতে চেয়েছে। কিন্তু অভিসন্ধির পথ নিলেও অথবা উপলব্ধির হ্রস্বতা থাকলেও ধর্মবেত্তাদের ধারণা যে একেবারে মিথ্যা হয়ে যায়নি, মহামানবদের কর্মাদর্শের মধ্যে তা অনুভূত হয়!

১০

হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে অষ্টম অবতার কৃষ্ণ। তাঁর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভাই রোহিনী পুত্র বলভদ্রও অবতাররূপে আখ্যাত হয়েছেন। পুরাণাদি গ্রন্থে এঁদের দুজনকেই ঈশ্বরের অংশাবতার বলা হয়েছে। কৃষ্ণের জীবন-কাহিনী কল্পনা কিম্বদন্তী মিলিয়ে যেমন গড়ে উঠেছে তা ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে কখনও স্পষ্ট ভাবে, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর কাহিনী আলেখ্যে তাঁকে ঈশ্বরের অংশাবতার বলা হয়েছে। তিনি মানুষ নন এমন কথাও বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য এ সবই ধর্ম সম্প্রদায়ী বিষ্ণু মাহাত্ম্য প্রচার করে দলভারী করার প্রয়াস।

কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অস্বাভাবিক কল্পকাহিনী সত্ত্বেও কৃষ্ণ যে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং মানব রূপেই তাঁর জন্ম হয়েছিল সে তথ্য মহাভারত ও অন্য পুরাণাদি গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ছিলেন দ্বাপর যুগে যাদব বংশীয় রাজপুরুষ। আজ থেকে হয়ত তিন বা সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা। তাঁর পিতা বসুদেব যাদবদের একজন সমাজপতি ছিলেন। মহৎ চরিত্রের মানুষ হিসাবে তাঁরও সমাজে প্রসিদ্ধি ছিল। কৃষ্ণের মাতুল কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে মথুরার রাজ সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। ভাগিনেয়র হাতে মৃত্যু হবে এইরকম দৈববাণী শুনে কংস ভীত হয়ে তাঁর ভগিনী দেবকীকে ও ভগ্নিপতি বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়। নির্দয় কংসের হাত থেকে সদ্যোজাত পুত্রকে রক্ষা করতে বসুদেব লোকচক্ষুর আড়ালে বৃন্দা-বনে গোপদলপতি নন্দের গৃহে কৃষ্ণকে রেখে আসেন এবং শিশু কৃষ্ণ সেখানেই নন্দ গৃহিনী যশোদার স্নেহে যত্নে বর্ধিত হতে থাকেন। বৃন্দা-

বনে গোপ-বালকদের সঙ্গে বাল্যজীবন যাপন করার সময় কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন, পুতনা রাক্ষসী বধ ইত্যাদি বহু অলৌকিক কার্য করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি মাতুল কংসকে যুদ্ধে নিহত করেন।

নন্দগৃহে বাস করার সময় তাঁর সুন্দর স্বভাব ও অলৌকিক ক্ষমতার জন্য কৃষ্ণ গোপ-সমাজে আদরণীয় হয়ে ওঠেন। তারপর ধীরে ধীরে কৈশোর কাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁর চরিত্রসুষমা, নেতৃত্ব ক্ষমতা, বলবীর্য, বিচক্ষণতা ও গভীর মানব প্রেমের জন্য তিনি যাদবগণের নেতা হিসাবে গণ্য হন।

কৃষ্ণের মথুরা বৃন্দাবনে থাকাকালীন তাঁর সময়কার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মগধাধিপতি জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবদের শত্রুতা হয়। জরাসন্ধের আক্রমণ থেকে আপনাকে ও যাদবদের রক্ষা করার জন্য তিনি পরিজন ও অনুগতদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী সুদূর দ্বারকায় গিয়ে নগরী নির্মাণ করে দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করেন ও যাদবদের রাজা হন। ধীরে ধীরে কৃষ্ণের নেতৃত্বে যাদবরা এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় এবং তাঁর আধিপত্য চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সে যুগে যখন কৃষ্ণ তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে মান্য হয়ে উঠেছেন, তখন আত্মীয় যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ দাতা, অর্জুনের রথের সারথি ও গীতার প্রবক্তা হিসাবে তিনি ভারতযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রেরণায় অন্যায় অশুভ নাশ করে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় তাঁর ভারত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ।

শ্রীমদ ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে কৃষ্ণ-রাধিকার পরকীয়া প্রেম, কৃষ্ণের পরস্ত্রী গোপরমণীদের সঙ্গে নর্ম-বিহার, রাধার মানভঞ্জন, রাস-বিলাস, তাঁর কুব্জা-সঙ্গম, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি যৌনগন্ধী কাহিনী ও আদি রসাত্মক কথার ছড়াছড়ি দেখা যায় যেগুলি অশ্লীল ও আবিল। বৈষ্ণব ধর্ম গুরুগণ এই সকল ঘটনার বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের কদর্যতা ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। এই যৌন আবেদনমূলক

ঘটনাগুলির মধ্যে হয়তো রূপকাশ্রিত আধ্যাত্মিক তথ্য থাকতে পারে কিন্তু এগুলি পাঠ করলে মনে হয় যে মানুষের মনে রসের আকর্ষণ জাগিয়ে তাদের দলে আনার বুঝি চেষ্টা করা হয়েছে। পূতঃ চরিত্র জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরের অবতাররূপে আখ্যাত, মানুষের মুক্তির দিশারী হিসাবে যিনি শ্রদ্ধেয় সেই কৃষ্ণের এরূপ কামাসক্তি ও অশোভন আচরণ কি করে সম্ভব হয়? "মহা-পুরুষ বা অবতার পুরুষদের দোষ হয় না কোনো কাজে, যা সাধারণ মানুষের হয়" এরূপ অসার ব্যাখ্যা ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা যা করে থাকেন তা অর্থ-হীন। আসলে স্থূলবুদ্ধি ও স্বার্থসর্বস্ব ধর্ম পণ্ডিতরা সম্ভবতঃ এসব কাহিনী পরবর্তীকালে কল্পনা করে রচনা করেছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত করা। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে ভাগবত গ্রন্থটি মহর্ষি বেদ-ব্যাসের রচিত বলে কথিত হলেও এটি অনেক পরবর্তীকালে অন্য কারও দ্বারা লিখিত বলে ধারণা হয়। এই গ্রন্থ বহু পুরাণ ও উপপুরাণের মতোই ব্যাসদেবের নামে চালু করা হয়েছিল। বহু পণ্ডিত এই সত্যটি বিভিন্ন তথ্য দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় তাদের ধর্মমতকে জোরদার করার জন্য মানুষকে স্বদল ও স্বমত ভুক্ত করার অভিপ্রায়ে তাদের আকৃষ্ট করতে কৃষ্ণের সম্পর্কে ঐ সকল আদিরসাত্মক কল্প কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সুবিধা মতো ঐ কল্প-কাহিনীগুলির স্বপক্ষে নানারকম অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা (?) জুড়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও হয়েছে।

পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দির, কোনারকের সূর্য মন্দির, খাজুরাহের শিব ও বিষ্ণু মন্দির এবং অন্যান্য বহু মন্দিরের বহির্দেওয়ালে যৌন ক্রিয়ারত মিথুন মূর্তি উৎকীর্ণ করাহয়েছে। স্থাপত্য শিল্পে এই মিথুন মূর্তির উৎকর্ষতা থাকলেও নিঃসন্দেহে দেবস্থানে এমন নগ্ন-স্থাপত্য কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার। মন্দির গাত্রে যৌন ক্রিয়ারত যুগল মূর্তির স্বপক্ষে পণ্ডিতগণ নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন কিন্তু একথা সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না যে মন্দিরের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকর্ষিত করার জন্যই এই যৌনতার প্রবর্তন করা হয়েছে। হয়তো এর উদ্দেশ্য ছিল যৌন উত্তেজনারূপ আনন্দ লাভ করার

পর তা প্রশমিত হলে লোকে দেবতা দর্শন করে ভক্তি নিবেদন করবে—দেবতার ভক্ত হবে। কৃষ্ণ সম্পর্কে আদিরসাত্মক কাহিনীগুলির কল্পনার উদ্দেশ্য হয়তো এই রকমই কিছু হবে।

বাসুদেব কৃষ্ণের স্থিতপ্রাজ্ঞতা, তাঁর ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিলব্ধ ও সাধনালব্ধ যোগৈশ্বর্য তাঁর অমোঘ নেতৃত্বশক্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁকে যে সেই যুগে দেশের শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও নানাবিধ চারিত্রিক গুণ গরিমায় তিনি যে সর্বগুণ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠে পুরুষোত্তমরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন তার পরিচয় রয়েছে মহাভারতে ও হরিবংশে।

স্বরূপোলব্ধির মধ্যে কৃষ্ণ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত—তিনিই ঈশ্বর, ঈশ্বরই তিনি। বাস্তবিক দ্বাপর যুগে ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে তার আত্মিক বিকাশ ও মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। পরমযোগী স্থিতপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণের উপলব্ধ-বাণীতে সমস্ত বেদ উপনিষদের মূল কথা যেন নতুন করে প্রতিভাত হয়েছে, যেন বিশেষভাবে অনুরণিত হয়েছে গীতার মধ্যে। তাঁর যোগবিভূতিময় সত্তা নিয়ে কৃষ্ণ যখন গীতার-বাণী মুখর, তখন তিনি সর্বশক্তিমান পরমমঙ্গলময় ঈশ্বরে লীন—তাই গীতা ঈশ্বরেরই দিব্য বাণী মঞ্জুষা।

"সর্ব ধর্মং পরিত্যজ্য মা মেকং স্মরণং ব্রজ।"

ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—শাশ্বত সত্তা। সমস্ত ধর্ম বা আচার বিচার ত্যাগ করে তাকেই স্মরণ নিতে হবে—তবেই পরম প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে মানুষকে স্পষ্ট করে এ কথা শোনালেন।

প্রথম এই গীতাতেই অবতারের আবির্ভাব ও তাঁর কর্মোদ্দেশের কথা পরিষ্কার ভাবে ঘোষিত হয়েছে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য সম্ভবামি যুগে যুগে।"

শ্রীকৃষ্ণ যে গীতার আদর্শের প্রবক্তা তার প্রকৃষ্ট ছবি তাঁর অমৃতময় জীবনের মধ্যেই প্রস্ফুটিত। পুতনা রাক্ষসী বধ, অঘাসুর বকাসুর সংহার, কালীয় দমন, কংস বধ, করুক্ষেত্র যুদ্ধ পরিচালনা (সাক্ষাৎভাবে অংশ গ্রহণ না করেও), জয়দ্রথ বধ ও সর্বশেষ যদুবংশ ধ্বংস—এ সমস্ত ঘটনার মধ্যে তাঁর যে ছবি ফুটে উঠেছে সেটি হলো ধীর স্থির শৌর্যময়, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন সুখে নিস্পৃহ, সত্য পরায়ণ ও ধর্মজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী এক আত্মজ্ঞ রাজর্ষির আলেখ্য। নন্দালয়ে তিনি ব্রজের দুলাল—সমস্ত ব্রজবাসীর স্নেহ ও ভালবাসার ধন। নন্দ, যশোধা এবং অন্য সমস্ত ব্রজবাসীর তিনি নয়ন-মনি। সকলে তাঁকে কি গভীরভাবেই না ভালবাসত। গোপ বালকদের সঙ্গে তাঁর কি সুনিবিড় প্রেম। কিন্তু যে মুহূর্তে কর্তব্যের আহ্বান এল তক্ষুনি স্থির চিত্তে শান্ত মনে কংসের ধর্মযজ্ঞে যোগ দিতে চলে গেলেন। কৃষ্ণ বিরহ অসহনীয় হওয়ায় ব্যথা কাতর নন্দ-যশোধা ও ব্রজবাসী-রাখাল বন্ধুরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল কিন্তু তিনি সঙ্কল্পে অটল রইলেন। কৃষ্ণ কোনো স্নেহ-মাখার কোমল বাঁধনে নিজেকে বাঁধেন নি অথচ তাঁর প্রাণ প্রেমে ছিল পরিপূর্ণ। সেই যে তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে গেলেন আর ফিরে আসেন নি। জীবনের লক্ষ্য পথে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেছেন। নতুন ভারতবর্ষ গঠন করার এক মহান আদর্শে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু সে জন্য কৃষ্ণ বাল্যবন্ধু বা প্রিয় পরিজনদের স্বার্থপরের মতো ভুলে যান নি। এ ছিল তাঁর মায়া রহিত বিভূতি—অনাসক্তি যোগ—মহান কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা—সত্যবোধে সমুজ্জ্বল জীবন-ভাবনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ও অন্য সবক্ষেত্রেই তিনি অবিচলিত থেকেছেন ; যেন কোনো ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ বা অনুৎসাহ কিছুই নেই। অথচ ঘটনার মূল পরিচালক বলতে তাঁকেই বোঝায়। আবার প্রভাস ক্ষেত্রে যখন তাঁর বংশধরেরা ও জ্ঞাতিবর্গ পরস্পর যুদ্ধ করে ধ্বংস হচ্ছিল তখনও তিনি নির্বিকার ছিলেন। ব্রহ্মভূত, প্রশান্তাত্মা। বিরাট পুরুষ ভগবানের মতোই আত্মজ্ঞ কৃষ্ণ ; তার জীবনের প্রতিটি কর্মের তিনি হোতা হয়েও দ্রষ্টা মাত্র। এমন কি যখন জরা ব্যাধির বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ হবার পর

তিনি যোগস্থ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন তখনও তাঁর কোনো বিকার নেই, প্রশান্ত মনে তিনি হত্যাকারী ব্যাধকে আশীর্বাদ করলেন। এই পুরুষোত্তমকে হয়ত তাঁর আলোকময় চরিত্রের জন্যই যুগ পরম্পরায় মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে এবং ক্রমে ক্রমে তিনি ঈশ্বরের অবতার রূপে কল্পিত হয়েছেন। আপন গুণৈশ্বর্যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের মহান শক্তি লাভ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ করতেই তিনি জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি নিয়ে কৃষ্ণরূপে জন্মেছিলেন। তারপর স্বরূপোলব্ধির আলোয় বুঝেছিলেন যে সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁরই মধ্যে ওতঃপ্রোত—তিনি ঈশ্বরে লীন।

সম্ভবত কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশাবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে পরবর্তী যুগে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্ভবত কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার করেছেন।

বিষ্ণুপুরাণে 'কেশবাবতার' আর্বিভাবের বর্ণনা আছে। কৃষ্ণই কেশবাবতার রূপে আখ্যাত হয়েছেন। ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে আপনার দুটি কেশ মাথা থেকে উৎপাটিত করেন—একটি সিত (শ্বেত) কেশ, অন্যটি কৃষ্ণ কেশ।

"উজ্জহারাত্মন ঃ কেশৌ সিত কৃষ্ণ মহামুনে"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ পরমাত্মার একটি কৃষ্ণকেশের অবতার। আদি পর্বে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"স চাপি কেশৌ হরিরুজ্জহর্হে শুক্লমেকম্
পরঞ্চাপি কৃষ্ণং তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং
যদূনাং কূলে স্ত্রিয়ৌ রোহিনীং দেবকীঞ্চ।
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোহ সৌ শ্বেতস্তস্য
দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয় কেশবঃ সংবভূব,
কেশৌ যোহ সৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ।"

[আদি পর্ব—১৭০, ৩৩, ৩৪]

দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে বিষ্ণু (হরি) তাঁর দুটি কেশ উৎপাটিত করলে শুক্ল কেশটি যদুকুলে বধূ রোহিনী ও কৃষ্ণ কেশটি দেবকীতে আবিষ্ট হয়। শ্বেত কেশ হতে বলভদ্র ও কৃষ্ণ কেশ হতে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য 'কেশবাবতার' কল্পনা এক উদ্ভট অবিশ্বাস্য ও বিসদৃশ কল্পনা। সম্ভবত বলরাম ও কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তে অলৌকিকত্ব এনে তাঁদের সম্পর্কে এমন বিচিত্র কল্পনা করে অবতার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বৈষ্ণবরা মনে করে কৃষ্ণ নরবরূপে পরম ব্রহ্ম। তাঁর দেহ তাদের ধারণায় 'অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ।' যে শাশ্বত চিন্ময় সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর সত্তা প্রতিটি মানুষের দেহাভ্যন্তরে রয়েছে কৃষ্ণ তারই অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর দেহ মধ্যে শাশ্বত চিন্ময় সত্তা বিশেষ অভিব্যক্তি নিয়েই বিরাজিত ছিল। পঞ্চ কোষের আবরণে ঢাকা কিন্তু মায়া রহিত, উপাধি রহিত মানুষের এই চিন্ময় সত্তাকে কেবল গভীর অন্তর্দৃষ্টিই অনুভব করতে পারে।

মহাভারতে কৃষ্ণ নারদকে বলেছেন, "হে নারদ! তুমি চর্ম চক্ষুতে আমার যে দিব্য গন্ধযুক্ত দেহ দেখছ এ দেহ মায়াময়। আমার স্বরূপ আছে অভ্যন্তরে মায়াময় শরীরের আচ্ছাদনে ঢাকা তাই তাকে দেখতে পাও না।" [শান্তিপর্ব, মহাভারত]

স্বরূপ দর্শন করতে হলে সাধনার মধ্য দিয়ে হৃদয়ের অতলে ডুব দিতে হবে। কৃষ্ণ নিজেই তাঁর শরীরকে মায়াময় বলেছেন, চিন্ময় বলেন নি। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে 'মৈত্রেয় বিদুর সংবাদে' বলা হয়েছে যে ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুই মহান ঋষির জন্ম হয়েছিল। তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে তপস্যা করে মোক্ষ লাভ করেন। পরবর্তীকালে ঐ নর ও নারায়ণ ঋষি পৃথিবীর অশুভ দূর করে ভূ-ভার হরণের জন্য মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। নারায়ণ যদুকুল গৌরব কৃষ্ণরূপে ও নর ঋষি কৌরব গৌরব অর্জুন রূপে জন্মায়।

মহাভারতেও কৃষ্ণের প্রকৃত দেহ নিয়ে জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ ও এক এক জন্মে কঠোর তপস্যার কথা বলা হয়েছে। অর্জুনকে একস্থানে কৃষ্ণ বলেছেন, "নরস্তমসি দুর্দ্ধর্ষ হরিনারায়ণোহ্যহম্। কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ

নরনারায়ণা বৃষী।" [বনপর্ব ১২শ, ৪৬ মহাভারত]
অর্থাৎ হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নর ও আমি নারায়ণ ঋষি। আমরা কালে কালে এই জন্ম নিয়েছি।' এছাড়া ছান্দোগ্য উপনিষদ গ্রন্থ থেকেও জানা যায় যে কৃষ্ণ মহর্ষি ঘোর আঙ্গি রসের কাছে ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত হন।[১] এই সকল তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ একজন মানুষ ছিলেন, ঈশ্বরের অংশাবতাররূপে তাঁকে যে কল্পনা করা হয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে পুরুষোত্তম হয়েছেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে জগতের মানুষকে নব জাগরণের চেতনা-বাণীর দ্বারা ও কর্মযোগের জ্যোতিতে সঞ্জীবিত করেছেন।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে কৃষ্ণের জন্মকর্ম তপশ্চরণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা জন্মে, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে পুরুষ যজ্ঞের প্রসঙ্গে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের উল্লেখ করা হয়েছে,

"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরস : কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্ত্বাচা পিপাস এব স বভূব সোহন্ত বেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যে তাক্ষিতম স্ম চ্যুতমসি প্রাণ সংশিত মসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ॥ (৩ ১৭।৬)

অর্থাৎ আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর ঋষি পূর্বোক্ত এই যজ্ঞ বিজ্ঞান দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—"যথোক্ত যজ্ঞবিদ্ মরণ কালে (যজুঃ) মন্ত্রত্রয় জপ করবেন। 'তুমি অক্ষত, তুমি অপ্রচ্যুত, তুমি সূক্ষ্ম প্রাণ স্বরূপ।' (এই বিজ্ঞান শ্রবণ করে) কৃষ্ণ (অন্য জ্ঞানে) স্পৃহ হয়েছিলেন।...

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই ধারণা হয় যে ঘোর ঋষি গুরুরূপে দেবকীতনয় কৃষ্ণকে উপদেশাদি দান করেছিলেন। এই কৃষ্ণ যদুবংশীয় কৃষ্ণ নন বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো যে মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববর্তী-কালের কথা হলো ছান্দোগ্যের এই প্রতিবেদন। তাঁদের মতে যদুবংশীয় কৃষ্ণের গুরু ছিলেন সন্দীপনী মুনি, ঘোর ঋষি নন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে মহা-ভারতের শ্রীকৃষ্ণকেই কেন্দ্র করে ছান্দোগ্যের এই উল্লেখ। তবে কৃষ্ণের গুরু ঘোর ঋষিই হোন অথবা সন্দীপনী মুনিই হোন উভয় ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি রক্ত মাংসের মানুষই ছিলেন।

পথে মানবাত্মার চরম বিকাশের ছবি। যেমন এক একজন মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে সাধনার ফলসিদ্ধি হিসাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করে ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়—তার পরম প্রাপ্তি ঘটে, তেমনি বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন মনুষ্যদেহ নিয়ে ত্যাগ, তপস্যা ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ সর্বশেষে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপেই জন্মেছেন। তিনি মহাযোগী, স্থিতপ্রাজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ, পুরুষোত্তম এবং ঐশ্বরিক শক্তিতে সমুজ্জ্বল এক অতি মানস সত্তা। ধর্ম-সম্প্রদায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁকে বিষ্ণুর অংশাবতার হিসাবে কল্পনা করেছে। একটা স্থূলবোধের উন্মাদনায় এই অবাস্তব কল্পনার উদ্ভব ঘটলেও পুরাণকার যেন আপন অজ্ঞাতে এক মহান সত্যকেই প্রকাশ করেছেন যে কৃষ্ণে ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

কৃষ্ণের অবতারত্বের বিষয় আলোচনা করলে তাঁর জ্যৈষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলভদ্রের কথাও বলতে হয়। ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁকেও ঈশ্বরের অংশাবতার বলা হয়েছে। কল্পনা করা হয়েছে যে তিনি বিষ্ণুর উৎপাটিত শ্বেত-বর্ণ কেশ হতে উৎপন্ন হয়েছেন। বাসুদেবের অপর পত্নী রোহিনী তাঁর জননী। কৃষ্ণের মতো বলভদ্রও শৈশব ও কৈশোর কাল বৃন্দাবনে রাখাল বালকদের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন। বলরামকে বিষ্ণুর অংশাবতাররূপে কল্পনা করে পরবর্তী কালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে বিষ্ণুর মাথার এক সিত (শ্বেত) কেশ হতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বলভদ্র বীর্যশালী পুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই হলেও কৃষ্ণকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন ও সেই সঙ্গে মান্যও করতেন। কৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন।

মল্লযুদ্ধ ও গদাচালনা বিদ্যায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। কৌরবরাজ দুর্যোধন ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে তাঁর কাছ থেকে গদা-চালনা শিক্ষা করে পারদর্শিতা লাভ করেন। মহাভারতে এইরূপ উল্লেখ আছে।

তাছাড়া সম্ভবত বলরাম যে যুগে কৃষি বিদ্যার অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মনে হয় তিনি তাঁর সময়ে দেশে কৃষির উন্নতি সম্পাদন করেন। বলরামের

জীবন-কথা ও তাঁর সম্পর্কীয় ঘটনাবলী যা জানা যায় সেগুলি থেকে তিনি কৃষি বিশারদ ছিলেন তা অনুমান হয়। সে যুগে দেশে কৃষি উন্নয়নে হয়ত তাঁর বিরাট ভূমিকা থেকে থাকবে।

বলভদ্রের অপর কোনো বিশেষ কর্মকৃতির কথা শোনা যায় না। মহাভারতে তাঁর বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণের বর্ণনা আছে, সে বর্ণনা থেকে সে যুগে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন তীর্থের বিবরণ পাওয়া যায়।

ভাগবতে তাঁর সম্পর্কে কেমন বর্ণনা আছে তাতে মনে হয় তিনি মদিরা পান করতে ভালবাসতেন। তাছাড়া তিনি নারী-সঙ্গ প্রিয়ও ছিলেন। এরূপ বর্ণনা আছে যে কৃষ্ণের রাসলীলার পর বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়েও কৃষ্ণ-সঙ্গিনী গোপীরমণীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। বলরামের এই রাস লীলা বা যৌনলীলার বর্ণনা অবিশ্বাস্য রকমের মন্দ ব্যাপার সন্দেহ নেই। এবং কোনোও মহাপুরুষ বা অবতার রূপে আখ্যাত মহামানবের পক্ষে এরূপ ঘৃণ্য আচরণ সম্ভবও নয়।

১১

কৃষ্ণাবতারের পর নবম যে অবতারের কথা পুরাণাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে তিনি গৌতম বুদ্ধ। তাঁকে বিষ্ণুর অংশাবতাররূপে কল্পনা করা হলেও প্রকৃতই তিনি এক উচ্চমার্গের মানুষ। তিনি অতীত ভারতবর্ষের এক দেশীয় রাজপুত্র ছিলেন। কৃষ্ণ মহাভারতের যুগে বর্তমান ছিলেন; তাঁর সময় থেকে বুদ্ধদেবের সময়ের ব্যবধান প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি। এই সুদীর্ঘ কালের দুই প্রান্তে এই দুই মহাপুরুষ অবতাররূপে আখ্যাত হয়ে বিরাজ করছেন। সম্ভবত অবতাররূপে তাঁদের কল্পনা পরবর্তী যুগের ধারণা হতে রূপায়িত। তাই রামচন্দ্রের দেড় হাজার বছর পর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের হাজার বছর পর তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটলেও তাঁদের সম্পর্কে যা কিছু কল্পনা কিম্বদন্তী সে সবই পরবর্তী কালের ধর্ম সম্প্রদায়ীদের উপস্থাপনা।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতমবুদ্ধের জীবনী ও কর্মকৃতির উপর তুলনামূলক বিচার করলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে যে তাঁরা তিনজনেই রাজপুরুষ এবং তিন জনই তাঁদের যুগের শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে স্বীকৃত। রামচন্দ্র ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা, বুদ্ধদেব রাজকুমার ও ভাবী রাজা এবং কৃষ্ণ ছিলেন নেতৃস্থানীয় রাজ-আত্মীয় ও যিনি পরে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে রাজা হন। তাঁরা তিনজনই মহান ব্রত নিয়ে পৃথিবীতে রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ অবয়ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের ব্রত সম্পন্ন করে মানুষকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে অমর লোকে চলে গেছেন। তাঁদের ব্রত ধারণ ও ব্রত উদ্‌যাপন পরমেশ্বরের অভিপ্রায়েই হয়েছে। রাম ও কৃষ্ণকে ধর্ম রাজ্য স্থাপনের জন্য, যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, যুদ্ধ সম্পর্কীয় কূটনীতিরও আশ্রয় নিতে হয়েছে। কৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবনী বর্ণনায় একটি

বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় রয়েছে। মহাভারত ও ভাগবতাদি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ জন্মেছেন বহু জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি নিয়ে; তেমনি জাতকের গল্পগুলি থেকে জানা যায় যে বুদ্ধদেব সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে এসেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ে গৌতম বুদ্ধকে ভগবানের অবতার রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তিনি "নাস্তিক অবতার" পাষণ্ড বেশে অসুরদের নানা উপধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। কতখানি ন্যক্কারজনক কপটতা—স্বার্থগন্ধী ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য! ধর্মগুরুর নামাবলী গায়ে চড়িয়ে ধর্মের ধ্বজা মাথার উপর তুলে ঈশ্বর এবং মহাপুরুষদের সম্পর্কে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনগড়া 'যা ইচ্ছা তাই' মন্তব্য করার অধিকার কে এদের দিলো সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে যেমন মন্তব্য করলেই তা সত্য হয়ে যায় না, আর মিথ্যা দিয়ে মানুষকে যেমন বেশীদিন ভোলানো যায় না তেমনই সত্যকেও চেপে রাখা যায় না।

তাহলে ভাগবতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধারণা করতে হয় যে করুণাঘন বুদ্ধের যারা অনুগত, তিনি যাদের উপদেশ দিয়ে গেলেন তারা সবাই অসুর বা পাষণ্ড। এমনকি সেজন্য তথাগত বুদ্ধও 'পাষণ্ড অবতার!'

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বুদ্ধের প্রতিভাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারা যায়নি। তাই তার অবিস্মরণীয় কর্মকৃতিকে সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম-সম্প্রদায়ী বা পরবর্তীকালে তাঁকে ঈশ্বরের 'অবতার' কল্পনা করে নিজেদের দলভুক্ত করতে চেয়েছে অথচ নিজেদের গণ্ডীকে পৃথক রেখে গৌতম বুদ্ধ বিষ্ণুর 'পাষণ্ড' বেশধারী অবতার 'যিনি পাষণ্ডদের উপদেশ দিয়ে ঠিক পথে চালিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন'—এইরূপ কপটাচার করেছে। সেই-সঙ্গে ধর্মমতের বিরোধের বীজও বপন করেছে। পৃথিবীর চারিদিকে যত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মী মানুষ রয়েছে তারা সবাই বৈষ্ণব পণ্ডিতের বিচারে পাষণ্ড আর অসুর হয়ে গেল, কেবল কৃষ্ণভক্তরাই একমাত্র পবিত্র ও প্রকৃত ভক্ত রইল এরকম সিদ্ধান্ত জঘন্য স্বার্থবুদ্ধির পরিচায়ক।

কল্কিপুরাণে কল্পনার পারা আরও এক ডিগ্রি উপরে উঠেছে। সেখানে

কল্কি অবতারের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে তিনি অধার্মিক বা উপধার্মিক বৌদ্ধ ও অন্য ম্লেচ্ছদের দমন করবার জন্য আবির্ভূত হবেন। কি রকম ধর্ম সম্প্রদায়িক স্বার্থ চিন্তা! অপর ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাব! প্রথমে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মীদের 'পাষণ্ড' অবতার এবং 'পাষণ্ড' আখ্যা দিয়ে দলভুক্ত করার অপচেষ্টা, তারপর যাদের দলে আনা হলো তাদেরই আবার অপধার্মিক বলে বা অধার্মিক অপবাদ দিয়ে দলনের চেষ্টা! এই কষ্ট কল্পনা ও কল্পনার অশুচিতাই অবতারতত্ত্বের এক অসার দিক।

গৌতম বুদ্ধ যখন জন্মেছিলেন তখন ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল? হিন্দুর ধর্মজীবনে তখন শুরু হয়েছিল অবক্ষয়। কুসংস্কারের ধূসর মেঘ আবৃত করে রেখেছিল অনাবিল ধর্মীয় আকাশকে। মানুষ আত্মিক বিকাশের সঠিক পথে চলতে পারছিল না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে উচ্চতর মার্গের ধর্ম সাধকদের ধর্মভাবনার কোনো যোগ ছিল না। ধর্মজীবনের আবিলতা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক করে তুলেছিল। এইরকম যুগ সন্ধিক্ষণে কপিল-বস্তুর শাক্যরাজ বংশে রাজা শুদ্ধোধনের পুত্ররূপে জন্মালেন সিদ্ধার্থ।

জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে সুকৃতির অধিকারী হয়ে (জাতকের গল্পগুলি উলেখ্য) রাজার কুমার সিদ্ধার্থ আপনার সাধনা লব্ধ 'বুদ্ধত্ব' অর্জন করেন। অহিংসা অর্থাৎ ক্ষমা, মৈত্রী ও প্রেম ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। সম্ভবতঃ তাঁর আগে সুদূর বৈদিক যুগে মহর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে এই অহিংসা ও ক্ষমার বাণী মূর্ত হয়েছিল; তবে গৌতম বুদ্ধের মতো এত স্পষ্ট, এত ব্যাপক ও সার্থকভাবে হয়ত সে অনাবিল কুসুম ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি। মানবের আত্মিক বিকাশের জন্য জীবজগতের প্রয়োজনেই বুদ্ধের আবির্ভাব। পরমেশ্বরের অভিলাষেই বুঝি তিনি মহৎ প্রাণ ও ঐশ্বরিক শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুগে যুগে কালে কালে এ রকম ঘটনা তো ঘটে চলেছে।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম সময়ে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক

ও ধর্মীয় অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল সে কথার ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব সংস্কারবাদী চিন্তাধারা নিয়ে ধর্মসংস্কারের চেষ্টা করেন নি।

গৌতম বুদ্ধ তখনকার ভারতবর্ষের 'কপিলাবাস্তু' নগরে শাক্যরাজ পরিবারে জন্মেছিলেন। বর্তমান নেপাল, রাজ্যের 'কোহালা' নগর ছিল সেকালের 'কপিলাবাস্তু'। তাঁর পিতা ছিলেন শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন। এই শাক্যবংশ অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু বংশ থেকে উদ্ভূত একটি শাখা বংশ। শুদ্ধোধনের পাঁচ পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা রানী মায়া দেবী গৌতম বুদ্ধের জননী। বহুদিন সন্তানহীনা থাকার পর বিবাহের দশ বছর অতিক্রান্ত হলে মায়া দেবী গর্ভবতী হন। পুত্রের জন্মের আগে তিনি স্বপ্ন দেখেন এক জ্যোতির্ময় শ্বেতহস্তী তার শুণ্ডে শ্বেত পদ্ম ধারণ করে কুক্ষি ভেদ করে ধীরে ধীরে তাঁর শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। রাজ জ্যোতিষীরা এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত গণনা করে বলেন যে রাজা শুদ্ধোধনের যে পুত্র জন্মাবে সে শিশু আপন চরিত্র ও কর্মগুণে ভবিষ্যতে মহাপুরুষ হয়ে ভুবন বিখ্যাত হবে। শিশু জন্মাবার পর রাজা ও রানীর মনের কামনা পূর্ণ হওয়ায় শুদ্ধোধন পুত্রের নাম রাখেন "সর্বার্থ সিদ্ধ।" তাই থেকে তাঁর নাম দাঁড়ায় 'সিদ্ধার্থ।' পুত্রের জন্মদান করে মায়া দেবী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিদ্ধার্থকে তাঁর মাসী বা বিমাতা কিসা গৌতমী প্রতিপালন করতেন। তাই তাঁকে 'গৌতম' নামেও উল্লেখ করা হয়।

সর্ববিষয়ে সিদ্ধার্থের প্রতিভা শিশুকাল থেকেই বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। বালক বয়স থেকেই দেখা যায় যে তিনি অন্য বালকদের মতো ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত নন, বরং সময় পেলে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হতেন। যৌবনকাল উপস্থিত হলে তাঁর মধ্যে তীব্র সংসার বৈরাগ্য লক্ষ্য করে শুদ্ধোধন পুত্রের শীঘ্র বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন। সিদ্ধার্থ প্রথমে বিবাহে রাজি ছিলেন না কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে অরণ্যবাসী ব্রহ্মচারী হয়ে ধর্মপালন করা অতি সহজ কিন্তু সংসারাশ্রমে থেকে শত শত পাপময় প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে ধর্মপরায়ণ হওয়া অত্যন্ত

কঠিন। যাই হোক, পরে তিনি বিবাহ করতে রাজি হন এবং গোপা নামে এক পরম রূপগুণসম্পন্না কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর কিছুদিন সিদ্ধার্থ মধুর আনন্দে সংসার-জীবন অতিবাহিত করেন। সাধ্বী পত্নী গোপার প্রেমে ও সেবাযত্নে তাঁর বেশ সুখেই জীবন কাটতে থাকে ও তাঁদের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মায়। কিন্তু একদিন নগর মধ্য দিয়ে প্রমোদ কাননে যাবার সময় জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু ও মৃত এইরূপ তিন ব্যক্তিকে দেখে তিনি মানুষের দুঃখ কষ্টে কাতর হয়ে পড়েন এবং 'অনিত্য' সংসারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন 'নিত্য' পদার্থ আছে যা পেলে মানুষ শোক তাপ কাটিয়ে শান্তি লাভ করতে পারে।' এই চিন্তা করে তিনি উনত্রিশ বছর বয়সে সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করেন। তারপর কঠোর তপস্যা করে সংসারের মায়া রহিত হয়ে পরম সত্য লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প সিদ্ধার্থ তপস্যা, ধ্যান ও যোগাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করেন। তাঁর স্বরূপোলব্ধি হলে তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ পরম জ্ঞানী হন।

এরপর বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্তাত্মা হয়ে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য ছিল অজ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথ দেখানো যাকে বলা হয়েছে নির্বাণ লাভ। ক্রমে ক্রমে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে তিনি দেশ জুড়ে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন।

আত্মোৎকর্ষতাই বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দয়াবৃত্তি পরিচালনা করা দরকার। সৎদৃষ্টি, সৎ সঙ্কল্প, সৎ বাক্য, সৎ ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন প্রভৃতি কর্মের দ্বারা মানুষ ধর্মপথে অগ্রসর হতে পারে। বৌদ্ধধর্মে জাতি বিচারের কলুষতা নেই।

বুদ্ধের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পিতৃমাতৃ ভক্তি, বৈভব সত্ত্বেও বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম, নিঃস্বার্থভাবে জীবন যাপন, অমানুষিক মানসিক ক্ষমতা, সত্যপরায়ণতা, কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপু বিবর্জিত চারিত্রিক গুণে তাঁর জীবন জ্যোতির্ময়। এই গুণাবলীর আলোকে আলোকিত হয়ে পবিত্রচেতা মহা-

পুরুষ বুদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য তাঁর নব ধর্ম প্রচার করেন। ঐ সময় তাঁর প্রচারিত ধর্মমত এতো বিপুল সংখ্যক লোক গ্রহণ করেছিল যে অন্য সব ধর্মমত বৌদ্ধধর্মের কাছে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লেখাটি বড় প্রাঞ্জল ;—

"বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে, কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনা ছিল স্বার্থত্যাগ, অহংকার ত্যাগ, ক্রোধ ত্যাগের সাধনা—ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি।"

গৌতম বুদ্ধের জীবন কথা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন অতি মানস সত্তা বিশিষ্ট এক মহাপুরুষ কিন্তু ঈশ্বরের অবতার নন যা রামচন্দ্র, কৃষ্ণ প্রভৃতির মতোই তাঁর সম্পর্কেও কল্পিত হয়েছে। পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়তো জগতের মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য, মানুষের দিশাহারা প্রাণে মুক্তির আলো জ্বালাবার জন্য (যখন অধর্ম ও জাতি বিদ্বেষের কারণে ও কুসংস্কারবশতঃ সমাজে গ্লানি এসে জড়ো হয়েছে, পাপের ক্লেদ জমে মলিন হয়েছে মানব হৃদয়) তাঁর জন্ম হয়েছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাজা থেকে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকল মানুষকে আত্মিক বিকাশের এক সাধারণ পথ দেখান বুদ্ধদেব—যে পথ সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে পরম মুক্তি বা নির্বাণের পথ। মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধকে উদ্বুদ্ধ করে প্রাণে জ্ঞানালোকের বর্তিকা জ্বেলে ঐ পথে চলার শিক্ষা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর অহিংসার বাণী ও ভলোবাসার মন্ত্র এতই উদার ছিল যে দেশের মানুষ তাঁকে ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করে-ছিল। সেই যুগে হয়তো জগতের কল্যাণের জন্য এরূপ একজন মহামানবের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। গৌতম বুদ্ধ 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' করে মাতামাতি করেননি ; স্বরূপোলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে মানুষ

পরম জ্যোতির্ময় ভগবানের অংশীভূত সত্তা, তাকে নির্বাণের পথে সম্পূর্ণ হতে হবে, পরম জ্যোতি-স্বরূপ হতে হবে। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমতে ঈশ্বরের সাকার মূর্তির কল্পনা নেই, তিনি ঈশ্বর সম্পর্কেও স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নি এবং তাঁরধর্মে জাতিভেদ ছিল না। এসব কারণেই হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ীরা তাঁকে 'নাস্তিক' অবতার বলে আখ্যাত করেছে এবং তাঁকে অস্বীকার করতে না পেরে এভাবে দলে টানার চেষ্টা করেছে। তিনি যেন 'নাস্তিক' অবতার হয়ে পাষণ্ডদের কৃপা করে তাদের জ্ঞানান্ধকার দূর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতদের স্বার্থপরতা ও গোঁড়ামি ছিল সীমাহীন! তারা অন্তরে বিলক্ষণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিল তাই কল্পনা করতে বাধেনি যে কল্কি অবতার আবির্ভূত হয়ে ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদের দমন করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অবতার কল্পনা কেবল উদ্ভট কল্পনাই নয়, স্বার্থের পূর্তির জন্য ঈশ্বরের নাম নিয়ে কদর্যতাও সেখানে ছিল।

১২

বুদ্ধদেবের পর দশম অবতার হলেন কল্কিদেব। পৌরাণিক যুগের ধারণা মতো এই অবতার পুরুষও মানুষ, কিন্তু আজও তাঁর অস্তিত্ব নেই। কল্কি পুরাণে এঁর কথা এমন ভাবে লেখা হয়েছে যেন বিষ্ণু কলিযুগের শেষে ভূভার হরণের জন্য মানুষরূপে জন্মাবেন এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ করে জগৎ রক্ষা করবেন। কল্কি পুরাণের বহু স্থানে কল্কির সম্পর্কে যে সব বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় কল্কিদেব জিতেন্দ্রিয় তো ননই পরন্তু কামের বশীভূত। ঈশ্বরকে নিয়ে মানুষের কতই না কপটাচরণ! কল্কি অবতার সম্পর্কে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে পুরাণ বর্ণিত কল্প কাহিনী ছাড়া তাঁর আর কোনো অস্তিত্ব নেই—অন্তত এখনও পর্যন্ত কল্কিদেব জন্মাননি। পুরাণ মতে তিনি কলিকালে আবির্ভূত হবেন। বর্তমান যুগ কলিযুগ কিন্তু তার পরিধি অনেকটা এইরূপ কল্পনা করা হয়েছে (পুরাণ মতে কলিযুগ পূর্ণ হতে ২০০০ বছর এখনও নাকি বাকি)। তাই "এখনও সময় আছে" —কল্কিদেব হয়তো আবির্ভূত হবেন। তবে কল্কিদেবের জন্ম-জীবন-কর্ম ভবিষ্যতে কেমন হবে পুরাণে সে সব সম্বন্ধে যে রকম কল্পনা করা হয়েছে তাতে কল্কি কাহিনী নিছক কল্প কাহিনী বলেই মনে হয়। তবে জগতের প্রয়োজনে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিশ্চয়ই কোনো মহামানবের আবির্ভাব হবে এই কলিযুগে এবং সেই অতিমানস সত্তার কর্ম প্রভাবে কলির ক্লেদ দূর হবে সে অনাগত দিন কবে আসবে কে বলতে পারে? তবে সে দিন আসবেই।

কল্কি অবতার সম্পর্কে পণ্ডিত পুরাণকারদের অভিমত যে কলিযুগের পাপ ও অরাজক অবস্থার কাল পূর্ণ হলে কল্কিদেব বিষ্ণুর অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন। দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটবে তা

তাঁরা পূর্বেই অনুধাবন করে জানিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারটিও রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখার মতো। পুরাণকাররা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে কলির অন্তে পৃথিবী যখন পাপে ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন জগৎ উদ্ধার করতে বিষ্ণু ভগবান কল্কিরূপে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে জন্মগ্রহণ করে দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় হয়ে হাতে অসি নিয়ে দুষ্কৃতদের দমন করে তাঁর লীলা প্রদর্শন করবেন। তিনি বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাবেন; তিনি যৌবনে সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করবেন। পদ্মাবতীরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূত হবেন সিংহল রাজার গৃহে। তারপর কল্কিদেবও কৃষ্ণের রাসলীলার মতো পরনারী নিয়ে লীলা করবেন। পরে যোদ্ধবেশে অসি চালনা করে যুদ্ধে দুষ্কৃতদের পরাজিত করে দমন করবেন। ঐ দুষ্কৃতগণ হলো অধার্মিক ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। অবশ্য কল্কিদেবের আবির্ভাব কলিযুগের কোন্ সময়ে হবে সে কথা পুরাণকার জানায়নি। এ সবই নাকি পুরাণবেত্তারা দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছেন ও ধ্যান যোগে জেনেছেন। এ সবই কল্কিপুরাণে বিবৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আজও কল্কিদেব আবির্ভূত হননি, যদিও সেকালের কল্পনাকে হার মানিয়ে বহু ধর্মসম্প্রদায়ী 'সাধুবাবা' কল্কিদেবের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

কল্কি পুরাণ একটি উপপুরাণ। এটি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের রচিত বা সঙ্কলিত বলা হলেও প্রকৃত তা নয়। পরবর্তীকালে কেউ এই পুরাণ কাহিনী রচনা করে বেদব্যাসের নাম দিয়েছে। কল্কি পুরাণের কাহিনী আগাগোড়া ধর্মসম্প্রদায়িদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্প কথা। কল্পনাগুলিও অবিশ্বাস্য রকমের কাল্পনিক।

কল্কি পুরাণের কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণাবতার তাঁর কর্মশেষে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলে কলির আবির্ভাব হয়। কিভাবে কলির জন্ম হলো? প্রলয় কালের অবসানে জগৎ স্রষ্টা লোক পিতামহ আপনার পৃষ্ঠ থেকে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন। সেই পাতকের নাম অধর্ম। অধর্মের মনোহারিণী প্রণয়িণী হলো মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে অধর্মের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়।

পুত্রের নাম দম্ভ ও কন্যার নাম মায়া। দম্ভ কোপন স্বভাব বিশিষ্ট ও তেজস্বী। তার ঔরসে ও ভগিনী মায়ার গর্ভে পুত্র লোভ ও কন্যা নিকৃতির জন্ম হয়। লোভ হতে নিকৃতির এক পুত্র জন্মায় তার নামক্রোধ। ক্রোধের ভগিনী হিংসা। ক্রোধের সহবাসে হিংসার যে পুত্র জন্মায় তারই নাম কলি। তার বর্ণ তৈলাক্ত কজ্জল সদৃশ, উদর বায়স তুল্য ; সে সর্বদা বাম হাতে পুং চিহ্ন ধরে থাকে। তার মুখমণ্ডল ভীষণাকৃতি, জিহ্বা লোল এবং সর্বাঙ্গ পূতিগন্ধময়। কলি দ্যূত ক্রীড়াস্থলে, মদ্যালয়ে, বারাঙ্গনা গৃহে ও সুবর্ণ ব্যবসায়ীর কাছে সর্বদা অবস্থান করে। তার ভগ্নি দুরুক্তির গর্ভে তার ঔরসে ভয় নামে পুত্র ও মৃত্যু নামে কন্যার উৎপত্তি হয়। ভয়ের সহবাসে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে পুত্র ও যাতনা নামে কন্যার উৎপত্তি হয়েছে। এই যাতনার গর্ভে নিরয় হতে শত শত পুত্র উৎপন্ন হয়েছে। এই ভাবে কলি বংশের বৃদ্ধি ঘটেছে ও অসংখ্য ধর্ম নিন্দুকের উৎপত্তি হয়েছে। তারা যজ্ঞ, বেদধ্যান, দান প্রভৃতি ধর্ম কর্মের লোপ করে ও বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের সাধনে যত্নশীল থাকে না। তারা আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতির আধার স্বরূপ। কলিরাজের অনুগত-অনুচর হয়ে তারা জীবজগৎ ধ্বংস করতে দিগ্‌বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কালক্রমে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষের রূপ নিয়ে জন্মাচ্ছে। এই মানুষেরা স্বল্পায়ু, কামুক, বেদবিহীন, দীন ও নীচ স্বভাব বিশিষ্ট হচ্ছে। এরা কেবল কুতর্ক করে। এরা অধার্মিক, ধর্মবিক্রয়ী, বেদ বিক্রয়ী, ব্রাত্য ক্রুর ও স্বার্থপর। এরা পরদাররত, মদ্যপ, বর্ণসঙ্কর কারক ; এরা হ্রস্বাকার, পাপাচারী, শঠ, নীচ সংসর্গে বাস করতেই এদের সর্বদা অভিরুচি। এরা নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুব্ধ ; কেশ সংস্কার, কেশ বিন্যাস ও আভূষণ ধরণেই এদের অভিরুচি ও আনন্দ। ধনীরাই কলিকালে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মান্য গণ্য, যার টাকা আছে সেই-ই পূজ্য। কলিকালে মানুষ শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করবে না, সত্যকে মানবে না ও অবিবেকী হবে।

পুরুষ ও নারী কলিকালে বেহায়া হবে। তারা লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে যৌনাচারে লিপ্ত হবে এবং আপন আপন পছন্দমত বিবাহ করবে।

সমাজে শালীনতা বলে কিছু থাকবে না। এইরকম বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও যারা সৎ ও সুন্দর ভাবে জীবন কাটাতে উৎসুক লোকে তাদের মূর্খ বিবেচনা করে অবজ্ঞা করবে। কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য বাচালতা করবে ও যশোলাভের জন্য ধর্মসেবা করবে। লোকে ধনাঢ্য হলেই সৎ ও সাধু বলে মান্য গণ্য হবে।

পুরাণকারের এই কলিবৃত্তান্ত একটি রূপকাশ্রিত কল্প কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। কল্পনার রূপায় আবৃত রূপক কাহিনীটি সুন্দর। শুধু সুন্দর নয় পুরাণকারের উপলব্ধি এক সত্যদর্শনে মূর্ত হয়েছে। সম্ভবত সেই অতীত কালেই পুরাণ রচয়িতা ধর্মীয় ও সামাজিক অবক্ষয় যে শুরু হয়েছিল তা টের পেয়েছে এবং তার পরিণতির কথা চিন্তা করে ও তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কল্কি অবতারের কল্পনা করেছে। কিন্তু সে সব কাজ করতে গিয়ে ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিকৃত বা উদ্ভট কল্পনা করে ঈশ্বরকে যে আদৌ ধারণায়-ধ্যানে অনুভব করতে পারেনি সেটাই প্রকাশ করেছে। যে পরিষ্কার ভাবনা নিয়ে কলি-রূপক সৃষ্টি করা হয়েছিল তা উদ্ভট কল্পনার জালে বদ্ধ হয়ে স্বার্থ পঙ্কে আবিল হয়ে গেল।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি পুরাণের এই বিভিন্ন যুগ-ভাবনাও মনে হয় কল্পনা। যুগ বা কাল কি মানুষের মানসিকতার স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি শুধু ভারতবর্ষেই রয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নেই তা কি করে হয়? এই চার যুগ কোনো সময় দ্বারা বদ্ধ নয় অথবা কোনো স্থানে অর্থাৎ দেশে বদ্ধ নয়। মানব মনের চার রকম স্তরকে বলা যেতে পারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সম্ভবতঃ পুরাণকার একথাই বলতে চেয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে অবিশ্বাস্য সময়ের সীমারেখা টেনে তা মনের বা বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কলি অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার। মায়া ও মোহে অভিভূত কুটিল, ঘোর তমোময়, অনুদার ও অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ মানসিকস্তরই হলো কলি। এখানে

বিবেক শ্লথ ও বিচার শক্তিহীন; সমস্ত কিছু মিথ্যার দ্বারা চালিত। মানুষ অধার্মিক হলেই কলিস্তর কবলিত হয়। এখানে ধর্ম হলো সেই বিশেষ মার্গ যা তার আত্মিক বিকাশের সহায়ক। তমোগুণের আধিক্যে ষড়-রিপুর উদ্দামতাই মনকে কলি-স্তরে নিয়ে যায়। মনের এই ঘোর তমোময় অবস্থা নিয়ে মানুষ যখন জীবন কাটায় তখনই কলিযুগ বা কলিকাল আসে।

দ্বাপর হলো মানুষের মনের দ্বিতীয় স্তর। এই অবস্থায় কিন্তু মনের ঘোর কাটেনা, কেবল সামান্য অজ্ঞানতা দূর হয়। বিচারশক্তি জমায় কোন্‌টা সৎ কোন্‌টা অসৎ, কি ন্যায় বা কি অন্যায় এসব বোধ জাগ্রত থাকে মনে। এরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে মানুষের যে সময় তাই-ই বুঝি দ্বাপর যুগ।

ত্রেতা অর্থাৎ তৃতীয় বিকাশমান মানসিক স্তর। যখন মনে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মায় ও মানুষ ত্যাগ ব্রতের অনুশীলনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যখন সে ভোগে বীতস্পৃহ হয় ও বিবেক বিচার শক্তিবলে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ অন্বেষণ করে ফেরে, যখন মানুষ তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে চায়। যখন সে আত্মজ্ঞ হতে চায়—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে উন্মুখ হয়, আত্মতত্ত্বালোচনা ভিন্ন যখন তার মনের অন্য কোন অবস্থাতেই রুচি জন্মায় না মনের সেই অবস্থার নাম ত্রেতা। যে সময় মানুষ এই মানসিক অবস্থা নিয়ে কাল কাটায় তাইই ত্রেতা যুগ।

সত্য হলো মনের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তোরণ। সত্য প্রভাময় ও আনন্দ স্বরূপ। মন যখন আত্মতত্ত্ব লাভ করে সত্য-স্বরূপ সেই আত্মানন্দেই ভাসতে থাকে এবং জগতের সমুদয় বস্তুতেই এক সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ অখণ্ড আত্মবস্তু, যিনি ঈশ্বর তাঁকেই লাভ করতে থাকে এবং তখন মানুষ সত্যস্বরূপ হয়ে যায়। এই সর্বোচ্চ মানসিক স্তরই 'সত্য' এবং সে সময় ধরে মানুষের মনে এই 'সত্য' অবস্থান করে সেটাই হল সত্যযুগ। এই আদর্শের আলোকেই পুরাণকার মনের চারিস্তরের ভিত্তিতে চার যুগের কল্পনা করে তাদের কাল ভাগ করেছে-- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মনের এসকল অবস্থান চক্রবৎ ঘুরে ফিরে আসে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ-

সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতঃ সম্পদ্যতে চরন্ ॥

অর্থাৎ মোহমুগ্ধ হয়ে স্থাণুবৎ শায়িত মানসিক অবস্থা যাকে মনের অজ্ঞান অবস্থা বলা যায় সেই অবস্থার নাম 'কলি'। দ্বাপরে মন পাশ ফেরে অর্থাৎ নাড়াচাড়া করে। 'ত্রেতা' হলো মনের ঘুম ভেঙে জাগ্রত অবস্থা। আর 'সত্য' অবস্থায় মন আলোকোজ্জ্বল হয়ে স্বচ্ছন্দ আনন্দে 'সত্যে' বিচরণ করে ফেরে।

পুরাণে ভারতবর্ষেয় অতীতদিনের যে সময়কে সত্যযুগ বা কৃতযুগ বলে আখ্যাত করেছে সে যুগ কি জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভিক যুগ ছিল যখন ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যে প্রভাময় হয়ে ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর অন্যতম সত্তা হিসাবে মানুষের সম্যক বিকাশ ছিল। তখন হয়ত মানুষের বিপুল ধনৈশ্বর্য ছিল না, ছিল না বৈভবের দম্ভ। তারপর ক্রমে ক্রমে ষড়রিপু কবলিত হয়ে মানুষ বুঝি মায়ামোহিত হয়ে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি স্তরে এসে পড়েছে। আজ বাস্তবিকই পৃথিবীর মানুষ প্রভূত শক্তি সম্পন্ন ও বস্তু তান্ত্রিকতার গরিমা যুক্ত হয়ে উঠলেও এবং নানা সূত্রে তার বুদ্ধির চরমোৎকর্ষতা ঘটলেও তার মানসিক স্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই তমোময় অবস্থার নামই কলি। হয়তো এই কারণেই বর্তমান যুগের নাম কলিযুগ।

কলি যে বাস্তবিক কোনো যুগের সংজ্ঞা নয় বরং একটি মানসিক স্তরের অভিব্যক্ত রূপ, এ ধারণার সমর্থন মেলে পুরাণকারের কল্পিত দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের একটি কথায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে কৃষ্ণ একবার ক্রোধভবে দুর্যোধনকে কটূক্তি করে বলেছিলেন, "দুর্যোধন! তুমি ঘোর কলি।"

এ কথার অর্থ হলো কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন যে দুর্যোধন, তুমি অত্যন্ত মোহযুক্ত ও অজ্ঞান। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের মুখে দুর্যোধনের প্রতি এই কটূক্তি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে কলি, দ্বাপর এগুলি মানসিক স্তরের পরিচয়। তা যদি না হয় তবে দুর্যোধনকে কৃষ্ণের "তুমি ঘোর কলি'

একথা বলার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্যোধনকে নিশ্চয়ই বর্ষ বা যুগ হিসাবে কৃষ্ণ সম্বোধন করেন নি।

যাই হোক পুরাণোক্ত কল্কি-কাহিনী কি ভাবে কল্পনা করা হয়েছে তার বর্ণনা করা যাক। সম্ভবত পুরাণ যখন লেখা হয় তার আগে থেকেই সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। তাই ভবিষ্যতে অনাচার ও অনৈতিকতা যে আরও প্রবলতর রূপ ধারণ করবে তা অনুমিত হয়েছিল। সেই ঘোর কলিতে দৈন্য পীড়িতা ধরিত্রীকে রক্ষা করতে নিশ্চয়ই কোনো অবতার আবির্ভূত হবেন? সেই মহান অবতার কল্কিদেব যিনি ধর্ম সম্প্রদায়ী পুরাণকারের দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেন। ইনি বিষ্ণুর অবতার।

কল্কিপুরাণের প্রারম্ভে পুরাণকারের প্রার্থনা শুনি—"যাঁর দোর্দণ্ড রূপ করাল সর্পের গ্রাসে পতিত ও বিষ জ্বালায় জ্বলিত বিগ্রহ হয়ে, কলিকালের অত্যাচারী ভূপালরা করবাল রূপ দণ্ডে দলিত হবেন; যিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে সিন্ধুজাত অশ্বে আরোহণ করে যোদ্ধ বেশে পুনরায় সত্যযুগের অবতারণা করবেন সেই সনাতন ধর্মের প্রবর্তক পরমাত্মা ভগবান কল্কিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন।" 'ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত পুরাণকার তার সঙ্গে এ কথাও জানাতে ভোলেনি যে—

(১) কলির প্রথম পাদে সকলে অধার্মিক ও অনাচারী হবে।

(২) কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণনাম বর্জিত হবে।

(৩) কলির তৃতীয় পাদে বর্ণসঙ্কর হবে।

(৪) কলির চতুর্থ পাদে সকলে একবর্ণ হবে ও বিষ্ণুর আরাধনা একেবারে ভুলে যাবে।

যখন এই চরম বিপর্যয় উপস্থিত হবে তখনই সনাতন ধর্ম রক্ষা করতে কল্কিদেব আবির্ভূত হবেন। এখানে লক্ষ্যের বিষয় হলো যে বুদ্ধদেবকে বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য স্বার্থগন্ধী ধর্মসম্প্রদায়ীরা বুদ্ধদেবকে এখানে বাদ দেবার কৌশল করেছে। বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে এরা সহ্য করতে পারছিল না যদিও পূর্বে দলভুক্ত করার জন্য তাঁকে নাস্তিক অবতার বলা হয়েছে। আসলে কল্কিদেবের কল্পনা বৌদ্ধদের ও ম্লেচ্ছদের

বিধ্বস্ত করার মনগড়া ব্যাপার—মানুষের মধ্যে ধর্মবিদ্বেষের বীজ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।

এরপর কল্কিপুরাণে প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় যে ব্রহ্মাকে পুরোভাগে রেখে দেবগণ বিষ্ণুকে পৃথিবীর দুর্দশার কথা জানালে বিষ্ণু সব শুনে জানালেন যে তিনি দক্ষিণ ভারতের শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর পত্নী সুমতির গর্ভে জন্মাবেন। তারপর তাঁর চার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিতভাবে কলিক্ষয় করবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী সিংহলের রাজা বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে 'পদ্মা' নামে অবতীর্ণা হবেন। এই কথা জানিয়ে বিষ্ণু দেবতাদের আদেশ দিলেন, "তোমরা পৃথিবীতে গমন করে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি মরু ও দেবাপি নামে দুই রাজাকে এবার পৃথিবীর শাসন ভার, অর্পন করব।"

ক্রমে উপযুক্ত কাল উপস্থিত হলে ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা ও সুমতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর নাম হলো কল্কি। ইতি পূর্বে তাঁর তিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মেছিলেন তাঁদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কল্কির উপনয়ন হলো। তিনি পিতা ও গুরুর কাছে বেদ ও গায়ত্রী শিক্ষা করলেন।

তারপর পুরাণকারের কল্পনা দৌড়ে গেল মহেন্দ্রপর্বতে ; পরশুরামের সঙ্গে যোগাযোগ হলো কল্কিদেবের। তিনি ভার্গবের কাছ থেকে সম্যক-রূপে বেদ বিদ্যা ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করলেন। শিবও কল্কিদেবকে অস্ত্র-শস্ত্র দান করলেন।

এরপর কল্কি গেলেন সিংহল দেশে। অনুচর শুকের মারফত রাজকন্যা পদ্মার সঙ্গে পরিচয় হলো। সাধ্বী পদ্মারূপী লক্ষ্মী বিষ্ণুকেই পতিরূপে কামনা করবেন, তাই অন্য পুরুষের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে অর্থাৎ অন্য রাজারা যাতে তাঁকে বিবাহ করতে না পারে সেজন্য কল্পনা করা হলো যে শিবের বরে কাম ও প্রেম দৃষ্টিতে যে পুরুষ পদ্মাকে দেখবে সে নারী হয়ে যাবে। হলোও তাই। যে সব রাজপুত্ররা পদ্মাকে দেখে মুগ্ধ হতো তারা সঙ্গে সঙ্গে নারীরূপ ধারণ করত। এদিকে কল্কির সঙ্গে দেখা

হলে পদ্মা বুঝতে পারলো যে তিনি কল্কিরূপী বিষ্ণু তখন তাঁকে পতি বলে বরণ করলেন। উভয়ের মিলন হলো।

কিছুদিন সিংহলে শ্বশুরগৃহে পত্নীর সঙ্গে প্রমোদ সুখে কাটিয়ে কল্কিদেব স্বস্ত্রীক শম্ভল গ্রামে ফিরতে ইচ্ছা করলে দেবরাজ ইন্দ্র সে কথা জেনে বিশ্বকর্মাকে যথা শীঘ্র শম্ভল গ্রামে একটি সুবর্ণ নির্মিত প্রাসাদ নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন।

এদিকে পদ্মাকে দর্শন করে যে সব রাজা বা রাজপুত্র নারীরূপ ধারণ করে ছিল কল্কিরূপী জনার্দনের দর্শন লাভ করে তারা তাদের পুরুষ-অবয়ব ফিরে পেল এবং কল্কিদেবের স্তুতি করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল।

সুবর্ণপ্রাসাদ নির্মিত হলে কল্কি দেশে ফিরলেন ও রাজ্য স্থাপন করলেন। পিতা বিষ্ণুযশা সে রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। পিতামাতা আত্মীয় পরিজন তাঁকে ও পদ্মাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

শম্ভল নগরে পদ্মার সঙ্গে কল্কিদেব সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। ক্রমে জয় ও বিজয় নামে তাঁদের দুই পুত্র জন্মাল। তারপর পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে দেখে কল্কি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। কল্কিদেব তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রথমে বৌদ্ধনগরী কীকটপুর জয় করেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে কল্কি ও তাঁর ভ্রাতাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এক বৌদ্ধ-রাজা শুদ্ধোদন তাঁর নাম (কল্পনা করা হয়েছে যেন গৌতম বুদ্ধের পিতা): কল্কি বাহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হলো। কল্কি শুদ্ধোদনকে অস্ত্রা-ঘাতে দমন করলেন।

এর মধ্যে মায়াদেবী এলেন। ইনি বৌদ্ধদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (লক্ষ্য করার বিষয় মায়াদেবীর কল্পনাও এখানে করা হয়েছে অন্যভাবে)। বৌদ্ধরা এঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রণক্ষেত্রে ফিরে এল। কিন্তু কল্কির আমোঘ শক্তিতে মায়াদেবী তাঁর মধ্যে ভার্যার মতো অন্তর্হিত হলেন। বৌদ্ধরা পৌরুষহীন হলে কল্কি তাঁর তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে ম্লেচ্ছ নাশ করলেন। তারপর তিনি কীকটপুর থেকে বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করে ফিরে গেলেন।

বৌদ্ধদের বিধ্বস্ত করে কল্কিদেব মুনিঋষিদের কাতর অনুরোধে তাদের

রক্ষার জন্য কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভের কন্যা কুথোদরীকে হিমালয় পর্বতে গিয়ে নিহত করলেন। রাক্ষসী কুথোদরী তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে মুনি ঋষিদের অত্যাচার করত।

এরপর দেখা যায় পুরাণকার দাশরথি রামচন্দ্র ও তাঁর বংশধরদের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। তারপর বর্ণিত হয়েছে কলির সঙ্গে কল্কিবাহিনীর যুদ্ধ। ধর্ম ও সত্যযুগকে সঙ্গে নিয়ে কল্কি-কলির সংগ্রামে কলির পরাজয়। কলির অনুচরদের মৃত্যু ও কলি পদানত।

পৃথিবীকে কলির গ্রাস থেকে মুক্ত করে কল্কিদেব ভল্লাট নগরে গিয়ে সেখানকার রাজা শশিধ্বজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শশিধ্বজ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ কল্কিদেবের ভক্ত। যুদ্ধে কল্কির পরাজয় হয় ও শশিধ্বজের গৃহে আনীত হলে তিনি রানী সুশান্তা কর্তৃক পূজিত হন। পরে রাজা শশিধ্বজ ও সুশান্তর কন্যা রমার সঙ্গে কল্কিদেবের বিবাহ হয়। রাজা শশিধ্বজ হলেন সাক্ষাৎ নারায়ণের শ্বশুর।

এরপর দেখা যায় পুরাণকারের কল্পনা মোড় নিয়েছে। রুক্মিনী ব্রত মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য সন্তান কামনায় রমাকে দিয়ে রুক্মিনী ব্রত পালন করানো হয়েছে। এই ব্রতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছে পুরাণকার। রুক্মিনী ব্রতপালনের পুরস্কার স্বরূপ রমার গর্ভে কল্কির মেঘমান ও বলাহক নামে দুই পুত্র জন্মায়। কল্পনার এমনই গতি যে পদ্মা ও রমাকে উপলক্ষ্য করে মহাভারতের দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার উপাক্ষান বর্ণনা করা হয়েছে।

এইভাবে কল্কিদেব পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র ও স্বজনদের সঙ্গে শম্ভল নগরে এক সহস্র বছর বাস করলেন। এই রাজনগর অমরাবতী আকার ধারণ করল। এখানে অষ্টষষ্ঠী তীর্থের অধিষ্ঠান হলো। এই পুণ্য স্থানে মৃত্যু হলে মুক্তি সুনিশ্চিত জেনে শম্ভলনগর ভূমণ্ডলের মধ্যে মোক্ষপদ দায়করূপে পরিগণিত হলো।

এরূপ বর্ণনা ও কল্কি রাজ্যের প্রশংসা করার পর ভক্তির আতিশয্যে কিম্বা ভক্তিরসের আবেশে অথবা কোনো অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্যে কল্কি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো যে জগৎপতি কল্কি পদ্মা ও রমার সঙ্গে অভিসার

করছেন। সেই কামলম্পট স্ত্রৈণ রমাপতির দিবারাত্রির বোধ থাকল না। বলা বাহুল্য কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যে মিথ্যা যৌনলীলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কল্কির ক্ষেত্রেও যেন তারই অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একই, সহজে লোকের মন মজানোর চেষ্টা করে দল ভারী করা। এর পরের ঘটনা কৃষ্ণের রামলীলার মতোই। কাহিনী এই রকম—

"একদিন পদ্মর মুখামোদরূপ কমল গন্ধোপ ভোগী সুবিলাসী কল্কি প্রভৃত ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা শোভামান এক পর্বত গুহায় প্রবিষ্ট হলেন। পতিকে গিরি গুহায় প্রবেশ করতে দেখে পদ্মা ও রমা সেখানে গিয়ে দেখলেন কল্কিদেব এক বিরাট রত্নখচিত প্রমোদকক্ষে শত শত পদ্মা ও রমার সঙ্গে বিহার করছেন। সে দৃশ্য দেখে পদ্মা ও রমা দুঃখে কাতর হয়ে ক্রন্দনরতা হলে কল্কি তাঁদের সঙ্গ দান করে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করলেন। তারপর তিনি পদ্মা ও রমা এবং অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে রতি বিলাসে রত হলেন। পুরাণকার এই যৌনলীলার বর্ণনা করে বলেছে এ সকল কথা যে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে তার মুক্তি লাভ হবে। ধর্মসম্প্রদায়ীদের এ চাতুরী না কপটতা তা বিচার সাপেক্ষ।

তারপর ক্রমে ক্রমে জগতবাসী কল্কিদেবের কথা জানতে পারল এবং সকলেই তাঁর প্রতি ভক্তিনত হলো। এইরূপে কল্কি জগতে পুনরায় সত্য যুগ আনয়ন করে সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই কাজ শেষ হলে তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন।

কল্কি পুরাণকার কল্কি দেবতার যে কল্প কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় যে কল্কিদেব পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হয়ে তার কর্ম করেছেন। কিন্তু এ ভাবে কাহিনী বর্ণিত হলেও পুরাণকার বলেছেন যে কলিযুগের শেষ দিকে ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ কল্কিদেব ভবিষ্যতে আবির্ভূত হয়ে উপরে বর্ণিত লীলা প্রদর্শন করবেন।

দশম অবতার কল্কিদেবের কথা যে অস্তিত্বহীন কল্প কাহিনী সে সম্পর্কে উপরের বর্ণনা পরিষ্কার। এখানে বিশেষভাবে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো প্রথম থেকে পঞ্চম অবতারের মতোই সম্ভবত দশম অবতার কল্কির

কল্পনা করা হয়েছে। কল্কিদেব কোনো ঐতিহাসিক মহাপুরুষ নন। এ-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধর্মসম্প্রদায়ীরা পূর্বের পথই অনুসরণ করেছে। এখানেই বুঝি পৌরাণিক কালের শেষ হয়েছে। পুরাণকার যেন দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে কল্পনা করেছে কলির শেষে কল্কিদেব শেষ অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে অবার সত্যযুগের প্রবর্তন ও সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবেন। এই অভিমত ব্যক্ত করে পুরাণকার অবতারত্বের উপর ইতি টানতে চেয়েছে।

১৩

এই যে বর্তমান যুগ কালস্রোতে অগ্রসর হয়ে চলেছে পৌরাণিক সংজ্ঞা মতো এর নাম কলিযুগ। পূর্ববর্তী তিন যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে পৃথিবীতে দুর্নীতি, অধর্ম ও পাপাচার এত পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি যেমন হয়ে চলেছে এই কলিকালে। তাই একে বলা হচ্ছে ঘোর কলিকাল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের কল্পনার উৎস কিন্তু পৌরাণিক ভারতবর্ষ এবং এ সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী।

তবে অতীত দিনের ইতিহাস, কিম্বদন্তী, কল্প কাহিনী ও রূপক কাহিনীর পাতাগুলি খুলে দেখলে মনে হয় যেন বর্তমান সময়ে অতীত কালের পাপপুণ্য সম্পর্কিত ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অন্যায়, ব্যভিচার, অপরকে ঠকানো বা কষ্ট দেওয়া, অধর্মাচরণ করা, ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, এসব কলিকালে অর্থাৎ আজকের যুগে বুঝি পাপ বা দোষ নয়। বরং সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক মানুষ আজ সমাজে উপহাসের বস্তু। তাদের মূর্খ বলে গণ্য করা হয়। এযুগে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য হেন অপকর্ম নেই যা করা হয় না। এখন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মারে, স্বামী তার স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারে, স্ত্রী তার স্বামীকে বিষ খাওয়ায়। বর্তমান সময়ে শ্রদ্ধার মূল্য নেই, ধর্মের বা ন্যায়ের স্বীকৃতি নেই, ত্যাগের আনন্দ নেই, কল্যাণের সুখ নেই। এখন স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আচার ব্যবহারে পশ্বচারও লজ্জায় অধোমুখ হয়। মানুষ আজ হৃদয়কে কলুপ এঁটে বাক্সবন্দী করে বুঝি (দুর্বুদ্ধি)-র মারপ্যাঁচ নিয়ে বস্তুতান্ত্রিকতার আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভালোর মুখোশ পরে প্রগতির স্বপ্ন দেখে। আজ হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে মানুষের পৃথিবী, চরমতম

দুর্নীতির কালো মেঘে শুভবুদ্ধির সূর্যালোক ঢাকা পড়ে তার জীবন-আকাশ অন্ধকারময়।

তবে কলিকালের তমসাচ্ছন্ন দিক ছাড়াও একটা আলোর দিকও আছে। বস্তু-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মানুষ আজ জগৎ ও জীবনের বহু রহস্যের কিনারা করছে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা নানা দিকে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে—হয়ত এই শক্তির বিকাশ তার আত্মশক্তি বিকাশের সহায়ক হবে। মানুষের মনীষা যথেষ্ট বিকাশ পাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক ভাবে বহু মানুষের ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে মানব-জীবন বহু-ভাবে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। জীবনে চলার পথে বস্তুবিজ্ঞানের ঐশ্বর্যে আজ মানুষ যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনই তার অধ্যাত্ম জীবনের আঙিনাও কম আলোকোজ্জ্বল হয়নি যদিও এসব কিছুই ছাপিয়ে আছে মানুষের অনৈতিকতা। এত সব উন্নতির পরিসংখ্যা নিয়েই কলিকাল ভয়ানক অবক্ষয়ের যুগ। লোভ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতি ষড়রিপু এ যুগে ভয়ঙ্কর ভাবে সক্রিয়। এখন মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, সদ্‌বৃত্তির কোনো স্বীকৃতি নেই আর স্বার্থ, লোভ, বঞ্চনা এবং প্রতিষ্ঠার কেরামতিতে গঠিত দুর্নীতি ও অধর্মের পায়ের তলায় চাপা পড়ে মানুষের বেদনা কেবলই গুমরে কাঁদছে।—

তাই হাহাকারে ও হতাশায় উদ্বেলিত প্রাণাবেগ, অসহায় অবরুদ্ধ জীবনের আকুতি, শুভ বুদ্ধির উন্মেষের ব্যাকুলতা ও সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, আজ করুণাময় জগদীশ্বরের কাছে বার বার আর্তি জানায়—

"তুমি এসো, প্রভু, তুমি এসো। আমাদের রক্ষা কর। জগৎ আবার সুন্দর হোক। আমরা বিষ বাষ্পে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে মুমূর্ষু! প্রভু তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমাদের রক্ষা কর। আমাদের আলো দাও।"

মানুষের প্রাণের কান্না ভগবান শুনছেন এবং তাঁর অবতাররূপ নিয়ে কোনো কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন কিনা জানা নেই, তবে তাঁর বাণী নিয়ে কোনো অতিমানস সত্তা নিশ্চয়ই আবার জন্মাবেন নতুন সত্য-যুগের আশ্বাস নিয়ে।

পুরাণকাররা তাদের বস্তু-বিজ্ঞান বিষয়ক সামান্য জ্ঞান ও স্বার্থ বুদ্ধি নিয়ে কল্পনা করে কল্কিদেবকে অশ্বপৃষ্ঠে অসি হস্তে যোদ্ধ বেশে সজ্জিত করলেও (আজকের এ্যাটমের যুগে এসব অস্ত্র খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়) এবং স্বার্থ বুদ্ধি নিয়ে অবতারের কর্মসূচী নির্ধারিত করলেও জগৎ-জীবনের ধ্বংস ও অবক্ষয় রোধের জন্য এক অবতার পুরুষ বা অতিমানস সত্তার আবাহনের যে আকুলতা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেটুকুই যথেষ্ট মহৎ মূল্যের বস্তু। কল্কিদেবের জীবন-কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনা হলেও, পুরাণকার কি কারণে আবার হঠাৎ পূর্ব ধারাটি অনুসরণ করেছেন তা জানা যায় না। বুদ্ধের পর আরও বহু মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মে-ছিলেন, তাঁরা কিন্তু কেউই অবতার বলে আখ্যাত হননি। কল্কি অব-তারের ভবিষ্যৎ আবির্ভাব কল্পনা করে পুরাণকার অবতার ভাবনার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। পুরাণের যুগও শেষ হয়েছে, তখনকার ধ্যান ধারণারও মোড় ফিরেছে। তবে পুরাণকার ভবিষ্যতে অবতার সম্ভাবনার রেশ টেনে রেখেছেন কল্কিদেবের অশ্বপৃষ্ঠে অসি হাতে অসাধুদের সঙ্গে লড়াই করার কল্পনা করেও। পুরাণ বলেছে কলিযুগের পরিমান ৪,২০,০০০ বছরের মধ্যে মাত্র ৫০০০ বছর পার হয়েছে (ধারণাটি কতদূর সঠিক বা কতখানি কল্পিত তা বিচার সাপেক্ষ)। সুতরাং ধর্ম সম্প্রদায়ী পুরাণ-কারের মতে এখনও সময় আছে, কল্কিদেব আবির্ভূত হবেন।

জগৎ ধ্বংস হয়ে বা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আবার আদিপর্বে ফিরে যাবে কিনা কে জানে? তাই কল্পনা কল্পনাই থাক। তবে তিনি আসবেন; মহান ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন কোনো মহামানব। তিনি ভগবানের অভিলাষ মতোই আসবেন জগৎ-জীবনকে নতুন দিশা দিতে ও নব আলোক ধারায় সঞ্জীবিত করতে।

পৌরাণিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার অবতার ধারণার শেষ হয়নি। কল্কি অবতার তাঁর অস্তিত্বময় সত্তা নিয়ে আদৌ আবির্ভূত হবেন কিনা জানা নেই কিন্তু বুদ্ধদেবের পর এদেশে জন্মগ্রহণ করে জাতির ধর্ম জীবনকে আলোকিত করেছেন এমন দু'চারজন মহামানব অবতার রূপে কল্পিত ও

প্রচারিত হয়েছেন। ঐ মহাপুরুষরা দুষ্কৃতদের বিনাশ বা সাধুদের রক্ষা করার ব্রত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁরা ধর্ম ও সমাজের গ্লানি দূর করেছেন, অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে মানবাত্মার বিকাশের পথ সুগম করেছেন এবং মানুষকে শুভবুদ্ধির চেতনায় জাগ্রত করার উদ্যম নিয়ে তাকে নতুন পথে পরিচালিত করেছেন যে পথ সর্বমঙ্গলের পথ—মানবাত্মার চরম বিকাশ বা মুক্তির পথ।

এইরূপ অতিমানস সত্তা বা মহাপুরুষের সংখ্যা পৃথিবী জুড়ে খুব কম ছিল না তবে হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ীরা তাদের ধারণামতো অবতার-লক্ষণ বুঝে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতাররূপে ধারণা করেছে। এঁদের পূর্বে যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, নানক প্রভৃতি অতিমানস সত্তা বিশিষ্ট মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করে তাঁদের জীবনের ব্রত সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্ভবত : এই সকল মহাপুরুষ অন্য ধর্মপথাবলম্বী বলে হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায় তাঁদের অবতার হিসাবে কল্পনা করেনি।

গৌরাঙ্গদেবকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ী ভক্তরা ঈশ্বরের অবতার রূপে আখ্যাত করেছে পৌরাণিক যুগের অনেক পর এবং তাদের এ ধারণায় মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্য যখন জন্মেছিলেন তখন দেশের অবস্থা কেমন ছিল ? তখন ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় বিরোধ ও প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব এবং দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতা চলছিল। ধর্মে গ্লানি, জাতিভেদ, কুসংস্কার। অনৈতিকতা এই সব দোষ নিয়ে ধর্মীয় আবিলতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, ভীরু, স্বার্থপর ও কপট করে তুলেছিল। মুসলমান রাজন্যবর্গের অত্যাচার, হিন্দু জমিদারদের নিষ্পেষণ ও সমাজপতিদের নির্যাতনে ঘরে স্বস্তি ছিল না, মনে শান্তি ছিল না। এবং প্রাণে অভয় উদ্যমের লেশ মাত্র ছিল না।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি নিয়ে গৌরাঙ্গদেব জন্মেছিলেন। পিতা জগন্নাথ ও মাতা শচীদেবী

ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত মানুষ। বাল্যকাল থেকেই গৌরাঙ্গের প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তিনি ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তিনি দু'বার বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু হলে মাতৃ আদেশে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু এর পরই তাঁর প্রাণে সংসার-বৈরাগ্য জাগে এবং প্রবলভাবে ভক্তিরসের উদ্দীপন হয়। গুরু ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গোপনে সংসার ত্যাগ করে কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমধর্মের বন্যায় দেশের সর্বস্তরের ধর্মীয় ও সামাজিক আবিলতাকে সরিয়ে চৈতন্যলোকে মানুষের আত্মিক বিকাশ ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। বাস্তবিক গৌতম বুদ্ধের পর নতুনভাবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে ভগবৎ প্রেমবহ্নিতে পবিত্র করে ভারতবর্ষে এক ধর্ম-বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন চৈতন্যদেব।

সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে আপনাকে নিষ্কলুষ করে শোক তাপ দুঃখ-সুখ-বিষাদ-আনন্দ সমস্ত কিছু অতিক্রম করে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ —বুদ্ধদেব মানুষকে এই মন্ত্রে সঞ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতে জাতি-ভেদ নেই, ভগবানের সাকার রূপ নেই, আছে কেবল মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে পরম সুন্দরকে পাওয়া। এক উদার প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি রাজা প্রজা সবাইকে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। ভালো হওয়ার ব্রত, সুন্দর হওয়ার ব্রতকে কমনীয় করে, সাধারণের সহজলভ্য করে তিনি মানুষের প্রাণের ঘরে সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে এমনটি আর হয়নি। গৌতম বুদ্ধের জন্মের ছয়শো তেইশ বছর পর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যে মহাপুরুষের বুকে ঈশ্বর প্রেমের উদ্ভাসিত পবিত্র আলো জ্বলে উঠেছিল তিনি মানব প্রেমের মূর্তরূপ মহামানব যীশুখ্রীষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাপর যুগে জীবিত ছিলেন তিনি তখন মানবহিতের জন্য অবিস্মরণীয় কর্ম করে গেলেও এবং অধর্মের নাশ ও ধর্মের পুনঃস্থাপনার সফল উদ্যম নিলেও তাঁর কর্মধারায় অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিও উল্লেখ-

যোগ্যরূপে যুক্ত ছিল।

বহুযুগ পরে ঈশ্বরের অবতাররূপে কৃষ্ণ মানুষের হৃদয় অধিকার করে থাকলেও বুদ্ধদেব তাঁর জীবিতকালেই দেশের অধিকাংশ মানুষকে তাঁর ধর্মমতের দ্বারা উদ্বোধিত করতে পেরেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং চৈতন্যদেব নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করেননি। গৌরাঙ্গ-দেব ছিলেন পরম বৈষ্ণব। 'কৃষ্ণ' নাম সার করে তিনি প্রেম কীর্তনে ভেসেছেন এবং সাধারণ মানুষকে উদ্বোধিত করেছেন। ভগবানকে প্রাণ-ভরে ডাক, সেই জ্যোতির্ময়ের আলোর ছোঁয়ায় তোমার সমস্ত কলুষ-অন্ধকারের বিনাশ হবে। তুমি অহংকার দূর করো, বিভেদ ভুলে যাও, হিংসা ত্যাগ করো, লোভ ও কামনাকে ভস্মসাৎ করো বৈরাগ্য-বহ্নি জ্বেলে। আর এ সমস্ত সহজেই তুমি করতে পারবে অন্তরে প্রেম জাগ্রত হলে। এই অমল প্রেম স্বতঃই জাগবে ঈশ্বরের পদপঙ্কজে নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে সমর্পণ করলে। ভক্তিভাবে ভাগবানকে ডাকলে, আন্তরিক ভাবে তাঁর নাম গান করলে এসব সহজে সম্ভব হয়। তিনি তখন নিজেই মানুষের হৃদয় পদ্মে নেমে আসেন। তাই 'কৃষ্ণ নাম করো সার'—ভক্তি নম্রচিত্তে দেহে মনে পবিত্র হয়ে তাকে ডাক, সংসার-পঙ্ক হ'তে তুমি উদ্ধার হবে। তুমি নিজে সত্য হবে, শিব হবে, সুন্দর হবে—যিনি সত্য-শিব-সুন্দর তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে। মানুষের জন্য ভগবানের এই অমিয়বাণী বয়ে এনে-ছিলেন চৈতন্যদেব। বুদ্ধদেবের মতোই রাজা থেকে অন্ত্যজ জাতির মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর 'প্রেম কীর্তনে' অংশ নিয়েছিলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ছিলেন নরোত্তম গৌরাঙ্গের সাধন-দেবতা। তাঁরা উভয়েই তাঁদের কালের মহোত্তম মানুষ, পরবর্তী যুগে যাঁরা বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন। চৈতন্যদেব কি কৃষ্ণের উত্তরসূরী হিসাবে ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগতে এসেছিলেন? তিনি মানুষকে শুনিয়েছেন—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্তেব, নাস্তেব গতিরণ্য যা॥

—হরিনাম ছাড়া কলির জীবের আর কোনো গতি নেই।

ঈশ্বরের নাম গান বলতে কি বোঝায় ?

মনে রাখতে হবে এ হলো বাহ্যিক কীর্তন নয়, এ অন্তর সংকীর্তন। বাহ্যিক নামোচ্চারণে কিছুই হয় না, মহাপ্রভুর মর্মকথা বুঝি এটাই। হরি বলিতে শ্রীচৈতন্য যে পুরুষোত্তমকে বুঝতেন সেই পুরুষোত্তম থেকে আগত শক্তি তরঙ্গ ও তার শব্দের ধারাকে হরিনাম বলেছেন তিনি। চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁর উক্তি—

"এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।"—

তাই 'নাম' বর্ণাত্মক নয়, সম্ভবত 'নাম' ধ্বন্যাত্মক। 'এক নামাভাস' বলতে ও কৃষ্ণ বলতে কি বোঝায় ? কৃষ্ণ কে ? না, কৃষ্ণ পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম পরমপুরুষের নাম মাহাত্ম্য স্মরণ মনন করতে করতে জীবের পাপদোষ যাবে। পাপ দোষ কি ? বিষয়-বাসনা ও ঈশ্বরে অনুরাগের অভাব। তাই এই পাপদোষের মুক্তি হলো 'নাম গান'। নাম বলতে পুরুষোত্তম ভূমি বা ব্রহ্মাণ্ড ভূমি থেকে আগত শব্দ তরঙ্গকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এই কৃষ্ণ নাম রূপ বাঁশীর তানই জীবকে সহস্রার চক্রে পৌছে দেবে। নিয়ে যাবে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে—কৃষ্ণ ভূমিতে—ভূমানন্দে ! তাই চৈতন্যদেব বলেছেন, "আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।"

চৈতন্যদেব যে বলেছেন 'কলির জীবের হরিনাম ছাড়া গতি নেই' এ কথার অন্য অর্থও উপলব্ধ হয়। মহাপ্রভু বর্তমান যুগকে কলিকাল বললেও, 'কলি' যে মানব মনের এক অবস্থা তা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। কারণ যদি তিনি বর্তমান যুগকে কলিকালই বুঝে থাকবেন তবে তিনি নিজে কি ভাবে এই কলিকালেই সনাতনকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'সনাতন শিক্ষা' নামে উপদেশ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সনাতনের প্রশ্ন শুনেই চৈতন্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আত্ম-জিজ্ঞাসু, তাঁর মন দ্বাপরস্তরের, তাই তাঁকে আত্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে ক্রমে ত্রেতায় নিয়ে গিয়ে পরে সত্যস্তরে উপস্থিত হতে হবে। তাই

মহাপ্রভু সনাতনকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের সেই সনাতন শিক্ষা বর্তমানে অধিকাংশ বৈষ্ণব বোঝে না। মহাপ্রভুর 'কলিতে এক মাত্র কৃষ্ণ নাম সার' এ কথার অর্থও অনেকে বুঝতে পারেনি। বিবেক ও বিচার শক্তিহীন, বিষয়-মদে-মত্ত অজ্ঞানীরাই 'কলির জীব', চৈতন্যদেব সে কথাই বলেছেন। তারাই অধ্যাত্ম রাজ্যের শিশু এবং যোগ ও জ্ঞান মার্গের অনুপযুক্ত। এই অজ্ঞানীদের ব্যবহারিক জগতের আনন্দদায়ক গীত বাদ্যের মাধ্যমে কোনো মহামানবের মূর্তি চিন্তায় মনকে আকৃষ্ট করে রাখার জন্য মহাপ্রভু চেষ্টা করেছিলেন। কারণ ঐ ভাবে চলতে চলতে যদি কারও মনে কোনো ও জন্মে প্রশ্ন জেগে ওঠে যে "এই নাম গানের দ্বারা কি লাভ হবে? পরমেশ্বর কি এবং তিনি কোথায় কি ভাবে থাকেন? জীব কোথা থেকে এসেছে, মৃত্যুর পর কোথায় যাবে?"

এই প্রশ্নগুলি মনে জাগলেই মানুষ আত্মজিজ্ঞাসু হয়ে উঠবে এবং ক্রমে আত্মজ্ঞানী হয়ে মুক্তিলাভ করবে।

মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের মধ্যে ঈশ্বর বিরহ, সমদৃষ্টি, প্রেমভাব এবং কঠোর তপস্যার ফল স্বরূপ যে অনাবিল কল্যাণের রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর অনুগামী ভক্তরা সে সব কতটা বুঝেছে বা গ্রহণ করেছে জানা নেই, তবে ধর্মসম্প্রদায়ীরা তাদের স্বার্থগন্ধী মনোভাব নিয়ে প্রচার চালিয়েছে যে চৈতন্যদেব ঈশ্বরের পূর্ণাবতার। চৈতন্যভক্তদের অবতার ভাবনাটিও ভিন্ন রূপ। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি!
অন্যান্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক একে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঞি॥

[চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পর্ব]

অর্থাৎ চৈতন্য আত্মা রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত দেহ চৈতন্যদেব। কিন্তু এই

ধারণা অন্যস্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। গৌরাঙ্গের মুখ দিয়ে এখানে বলানো হয়েছে—

"গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।
[চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পর্ব]

অর্থাৎ তিনি যেন শ্রীরাধিকা ; কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে স্পর্শ করবে না। এর অর্থ চৈতন্যদেব রাধিকার মূর্ত রূপ নিয়ে জন্মেছেন। তাহলে চৈতন্যদেব আবার অবতার কেন ? বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ধর্মবেত্তার এ বিচিত্র কল্পনা। একবার রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত সত্তা রূপে শ্রী গৌরাঙ্গ কল্পিত হলেন আবার অন্যক্ষেত্রে তিনি কেবল রাধিকার মূর্ত বিগ্রহ রূপে কল্পিত। অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে না বুঝে এরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যখন যা ইচ্ছা তাই-ই কল্পনা করেছে। এছাড়াও বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ীরা চৈতন্যদেব যে অবতার-দের ভাবও গ্রহণ করতেন, তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে বিষয়ও প্রচার করেছে—

"বরাহ আকার প্রভু হইলা সেইক্ষণে।
স্থানুভাবে গাড় প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশ খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি॥
[চৈতন্য ভাগবত, মধ্য, ৩য় পর্ব]

মহাপুরুষকে নিয়ে উপরের লেখাগুলিতে কি রকম অর্বাচীন সুলভ কল্পনা করা হয়েছে সে কথা ভাবলে দুঃখই পেতে হয়। ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থের পঙ্কে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে চৈতন্য গরিমা। চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে তারা মানুষকে ধোঁকা দিতে বর্ণনা করেছে যে বরাহভাবে চৈতন্যর হাতে পায়ে ছারটি খুর বেরিয়ে ছিল। হায়, কি অবাস্তব কল্পনা ! তারা এভাবে মহা-পুরুষ চৈতন্যদেবকে প্রকারান্তরে হেয়ই করেছে।

নিঃসন্দেহে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মমতকে সুলভে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করার

জন্য চৈতন্যদেবকে ঘিরে এই অবতার কল্পনা করা হয়েছিল। এছাড়াও আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা তাঁর সম্পর্কে অসত্য প্রচার করে তাঁর ভাবাদর্শ ও কর্মাদর্শকে কলঙ্কিত করেছে। মহাপ্রভু চৈতন্য তাঁর মানব প্রেমের জাহ্নবী ধারায় অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদজনিত পাপ জাতির জীবন থেকে ধুয়ে ফেলতে সচেষ্ট ছিলেন। ভগবান ভক্তের একান্ত আপন, সেখানে জাতিভেদ নেই, বিভেদ নেই, বর্ণ বিচার নেই—এই ছিল চৈতন্যদেবের মতাদর্শ। কিন্তু ধর্ম সম্প্রদায়ীরা তাঁকে অবতার কল্পনা করে জানিয়েছে যে তিনি জাতিভেদ মানতেন। এভাবে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে তারা আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে। উদ্দেশ্য ছিল বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা বজায় রাখা। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৭।৫৬-৬০ পংক্তিতে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেব উড়িষ্যার কটক থেকে বৃন্দাবন যাত্রার পথে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারও অন্ন গ্রহণ করতেন না। তা ছাড়া তাঁর মুসলমান ভক্ত হরিদাস ও জাতি ভ্রষ্ট সনাতনের সঙ্গে (এই সনাতনকেই তিনি আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন) বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন। তাঁদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসতেন না, তাদের দূরে দূরে রাখতেন।

ধর্মসম্প্রদায়ীরা মহাপুরুষ চৈতন্যদেবের মুখ দিয়ে এমন কথা বলিয়েছে যা সমদর্শী ঐ মহাপুরুষের চরিত্রে কালিমা লেপন করা ছাড়া আর কি? অথচ তারা চৈতন্যদেবকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এসব কাজ করেছে। বর্ণনাটি এই রকম—

"দোঁহা না স্পর্শিহ ইহো জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞক তুমি কুলীন প্রবীণ॥

[চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম]

পুতঃচরিত্র মহাপুরুষ চৈতন্যদেবকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ধর্মসম্প্রদায়ীদের কি জঘন্য প্রচেষ্টা!

চৈতন্যদেবের পর হিন্দুর অন্য ধর্মসম্প্রদায় পরম পুরুষ রামকৃষ্ণকেও অবতার বলে আখ্যা দিয়েছে। "অবতার—বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ" অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠতম অবতার রামকৃষ্ণকে নমস্কার। বলা বাহুল্য এসব রামকৃষ্ণ ভক্তদের ভক্তির আতিশয্য। নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। তবে তিনি শ্রেষ্ঠতম 'অবতার' কিনা তা বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার কারণ 'অবতারে'র অভিব্যক্তি কল্পনার ভিত্তি ভূমিতেই হয়েছে বলে ধারণা হয়।

এক অতি সাধারণ ঈশ্বরপরায়ণ ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মার দেওয়া নাম গদাধর। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লেখাপড়া পাঠশালা পর্যন্ত বলা চলে। কিন্তু কিশোর গদাধর তাঁর অতুলনীয় মধুর সরল স্বভাবের জন্য গ্রামের সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর বালক বয়সে তাঁকে ঘিরে দু' একটি অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা থাকলেও সে সব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ক্রমে বয়স বাড়লে রামকৃষ্ণ রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সুপণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এসে বাস করতে লাগলেন। রামকুমারের দেহান্তের পর গদাধর দেবী পূজার ভার পেলেন। এখন থেকে তাঁর মধ্যে প্রায়ই দিব্য ভাবাবেশ হতে থাকে। দিব্য অনুভূতি তাঁকে ঈশ্বর লাভে ব্যাকুল করে তোলে। তিনি কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। পূর্ব জন্মের সুকৃতির জন্য জন্মলগ্ন থেকেই বুঝি তিনি যোগৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ছিলেন। ঈশ্বর লাভের মধ্যে তাঁর পরম সিদ্ধি লাভ হয়, যে ঈশ্বর তাঁর 'মা— মাতৃরূপা কালী— পরমা প্রকৃতি —আদ্যাশক্তি মহামায়া।' বিভিন্ন ধর্মমতের সম্যক অনুশীলন করে তিনি সর্ব ধর্মের মূল কথা যে একই ঈশ্বরের কথা—একই সত্য কথা তা উপলব্ধি করেন এবং সর্বধর্মের সমন্বয়ের এক সুষ্ঠুরূপ প্রচার করেন তাঁর দিব্যবাণীতে—"যত মত তত পথ, লক্ষ্য এক।" রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই ভাব সমাধির মধ্য দিয়ে দিব্যলোকে বিচরণ করতেন। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক বিশেষ ব্রত নিয়ে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর ব্রত পালনে উদ্যোগী হন ও আপন জীবনাদর্শ সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরেন।

সারদাদেবী তাঁর পত্নী। তিনিও পরমা প্রকৃতি রূপা পরম সাধিকা মহিয়সী

নারী। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি হীনতার শিক্ষাদানই মানুষের প্রতি রামকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা। অন্যকে শিক্ষা দেবার জন্য নিজের জীবনে তিনি তাঁর এ আদর্শ কঠোর ভাবে পালন করেন। তিনি পত্নীর সঙ্গে কখনও স্বামী-স্ত্রী রূপে জীবন কাটাননি যদিও প্রেম ও প্রীতির সঙ্গে পরস্পর পাশা-পাশি বাস করেছেন। তাঁদের দিব্য দাম্পত্য জীবনের আঙিনায় ঈশ্বর আসক্তি ছাড়া অন্য কোনো আসক্তি রেখাপাত করেনি। রামকৃষ্ণের ছিল অবিস্মরণীয় সারল্য ও মধুর স্বভাব। দিব্য প্রেমৈশ্বর্যে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। করুণাময় ভগবানের অভিলাষ চরিতার্থ করতে ঈশ্বরের চিরন্তন বাণীর নবরূপায়ণ করেন তিনি। এই দিব্য পুরুষ ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশেষ ভাবে শক্তিমান ছিলেন। তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ স্বরূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল ভাগবৎ বিভূতি।

রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃতপ্রতিটি কথাই তাঁর দিব্য জীবনের পরীক্ষিত সত্য। তাঁর প্রতিটি বাণীই জীবন্ত ও শক্তিপূর্ণ। তাঁর উক্তি ঈশ্বরের অর্থাৎ তাঁর 'মার' সাক্ষাৎ বাণী।

কায়মনে সরল সহজ ভাবে ভক্তির সঙ্গে নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পিত করলে; কেবল বিশ্বাস করে তাঁকে প্রাণভরে আসক্তি রহিত হয়ে ডাকলে তিনি মানুষকে কাছে টেনে নেবেন। তাঁকে প্রাণ ভরে ডাক—তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হও, তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। মুক্তির দিশারী রামকৃষ্ণের এই মহাবাণী।

ছোট ছোট কথা ও মর্ম ছোঁওয়া উপমার সাহায্যে সরলভাবে সহজ ভঙ্গিমায় উপদেশ দিয়ে পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছেন এত সহজ করে, এমন সুন্দর ভাবে, এত আলো ভরে তাপিত প্রাণে মুক্তির বার্তা বুঝি আগে কেউ এনে দেয়নি।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, ত্রিপিটকে বুদ্ধদেব যা জানিয়েছেন, বাইবেলে যীশু যে সত্যের জ্যোতি প্রকাশ করেছেন, কোরাণে হজরত মহম্মদ যে মহান সত্যের কথা বলেছেন, কৃষ্ণ-নাম কীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ যে দিব্য

রসের সিঞ্চন করেছেন, রামকৃষ্ণ সহজ সরল করে সেই সব ভাবেরই প্রচার করার উদ্যোগ নেন তাঁর উপদেশের মাধ্যমে ও অনুগত শিষ্যদের দ্বারা। অবশ্য তাঁর কথা প্রচার করার জন্য তিনি কখনও তাঁর শিষ্যদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলেন নি। কাননে সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হলে যেমন দূর দূরান্তর থেকে মৌ-মাছি সেই পুষ্প-সৌরভের আকর্ষণে এসে জড়ো হয় তেমনই ঈশ্বর ভক্ত মানুষ, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী মানুষ, সংসারের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত তাপিত মানুষ শান্তি সুখ পাবার আশায়, আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর পাবার আশায় দেশ বিদেশের অনেকেই ছুটে এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে বা তাঁর ভাবাদর্শের আঙ্গিনায় এবং সকলেই প্রাণে তৃপ্তি নিয়ে ফিরে গেছে। কিছু প্রতিভাবান পবিত্র চেতা, জ্ঞানী ও তেজস্বী মানুষ নিয়ে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষণজন্মা আত্মজ্ঞ পুরুষ বিবেকানন্দ, স্থিতধী ব্রহ্মানন্দ, পরমজ্ঞানী অভেদা-নন্দ প্রভৃতি প্রথম সারির রামকৃষ্ণ শিষ্য। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর মুখ্যত বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে পৃথিবী জুড়ে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারিত হয়, আজও যা জনমনে বিশেষ প্রভাব ফেলে মানুষকে শান্তি দিচ্ছে আনন্দ দিচ্ছে ও মুক্তির পথ দেখাচ্ছে।

অবশ্য জনসমাজে রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম প্রচার করেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। তার পূর্বে তিনি ছিলেন লোক মনের ও লোক চোখের আড়ালে নিতান্ত সামান্য এক সাধু মানুষ। এ বোধহয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল। কারণ বিদগ্ধ ও যুক্তিবাদী মানুষদের কাছে রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি হয়ত সহজে হতো না। দিব্যপুরুষ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে যুগসন্ধিতে এ দেশের মাটিতে ঘটে তখন ছিল ধর্মীয় অবক্ষয়ের যুগ। ধর্মীয় কুসংস্কার সামাজিক আবিলতা ও শিক্ষার দম্ভ মানুষকে নাস্তিক ও যুক্তি সর্বস্ব করে তুলে-ছিল আর বুদ্ধির মার প্যাঁচ নিয়ে তারই সঙ্গে মানুষ হারিয়ে ফেলছিল তার পেলব হৃদয় বৃত্তিকে। শুধু প্রাচ্য দেশে নয় পাশ্চাত্যেও মানুষ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের অহমিকায় শান্তির পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে-

ছিল। বুঝি পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের অধ্যাত্ম ভাবধারার অমৃত বর্ষণের প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দ আপন বীর্যবত্তা, প্রখর জ্ঞান, পরম ঐশ্বরিক শক্তি ও সুবিস্তীর্ণ মানব প্রেম নিয়ে রামকৃষ্ণের বাণীর মূর্ত বিগ্রহরূপে (তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও স্বকীয়তা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন) জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষকে অধ্যাত্ম চেতনায় সঞ্জীবিত করে গেছেন। ভারত-ভূমির মানুষের জন্য দেখিয়ে গেছেন বিকাশ লাভের নব পথ।

রামকৃষ্ণ তাঁর ভাবাদর্শের পেলব আলোকধারায় প্রাণবন্ত করে যে বিশেষ কাজগুলি করেছিলেন অথবা পরমেশ্বর জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁকে দিয়ে যে কাজগুলি করিয়েছিলেন সেগুলি হলো—

(১) সনাতন ধর্মকে আবিলতা মুক্ত করে স্ব-মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ধর্মসম্পর্কীয় জটিলতাকে প্রাঞ্জল করা। সহজ সাবলীলভাবে গৃহস্থ মানুষ যাতে ধর্মমুখী হয়ে শান্তি লাভ করতে পারে ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাতে অবহিত হতে পারে তার পথ দেখিয়ে দেওয়া।

(২) সাকার ভাব, নিরাকার ভাব, শূন্য ভাব—ঈশ্বরোপাসনার এই ধারা-গুলির সঠিক মূল্যায়ন করে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করা এবং এগুলি যে ঈশ্বরো-পাসনার ও ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন কথা ছাড়া আর কিছু নয় সহজভাবে তা দেখিয়ে দেওয়া।

(৩) সর্বধর্ম সমন্বয় অর্থাৎ একলক্ষ্যমুখীন বিভিন্ন ধর্মমত। এই সমন্বয়বাদ প্রাঞ্জল করে সহজবোধ্য করে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করা বিশ্ব-মৈত্রীর আলোয় মানুষকে জাগ্রত করার অভিলাষে। মানুষকে অ-মৈত্রী, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ভুলে সত্যালোকের পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ।

(৪) সহজ ভাষায়, সহজভাবে হৃদয়গ্রাহী করে সাধারণ মানুষ যাতে উপলব্ধি করতে পারে তেমনভাবে অতুলনীয় উপমায় ভরা বহু ধর্মীয় তত্ত্বকথা পরিবেশন করে তিনি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উদ্দীপনা এনেছেন। তাদের শান্তি-লাভের পথ সুগম করেছেন ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়েছেন

রামকৃষ্ণ-কথা বা অমৃত কথার মাধুর্যে। তাঁর দিব্য জীবন ও বিশ্বব্যাপি মানবাত্মার বিকাশের সাবলীল যে পথ তিনি দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁর ভক্তরা ও গুণমুগ্ধরা তাঁকে অবতাররূপে আখ্যাত করেছে।

আজ অতিমানস সত্তা বিশিষ্ট ঐশ্বরিক শক্তির জ্যোতিতে পরম অভিব্যক্ত মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ ভগবানের মূর্ত-বিগ্রহরূপে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন—অবতাররূপে কল্পিত হয়ে পূজা পাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে অলোকসামান্য মহাপুরুষ। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে আপন কর্ম গরিমায়, ধ্যান মহিমায় ঈশ্বরে একীভূত হয়েছেন। তাই রাম আর ভগবানে যেমন ভেদ নেই, কৃষ্ণ আর পরব্রহ্মে যেমন পার্থক্য নেই, বুদ্ধ-ঈশা-মহম্মদ আর পরমেশ্বরের যেমন অভেদাত্ম, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণও সেই উপলব্ধ সত্য নিয়ে বিরাজিত। রামকৃষ্ণ তাঁর নিজ মুখেই এই সত্য কথাটি বলে গেছেন—"যে রাম, সেই কৃষ্ণ—ইদানীং দুইয়ে মিলে রাম-কৃষ্ণ।"

১৪

প্রতিটি মানুষের জন্যই বুঝি ভগবানের ঘরের দুয়ার খোলা। প্রতিটি জীবন-নদীই বুঝি মোহনায় মিশে ঈশ্বর-বারিধি হবে। ভগবানের এ লীলা-বিলাস।

পৌরাণিক অবতার-তত্ত্ব মানব মনের এক নিছক ধারণা বা কল্পনা যা মানুষকে ঈশ্বর সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছে কিম্বা ধর্মসম্প্রদায়ের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে অবতার কল্পনা করে প্রচার অথবা সমস্ত ব্যাপারটা ভক্তির আতিশয্য কি না এর কারণ বিবেচনা করা তর্কসাপেক্ষ হলেও অবতার কল্পনার মধ্যে এক ধারাবাহিক ক্রমবিকশিত চিন্তার রূপ যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি এই ভাবনার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। যদি অতিমানস সত্তা বিশিষ্ট দিব্যপুরুষদেরই অবতাররূপে ধারণা করা হয়ে থাকে যাঁরা কেউই ঈশ্বরের অবতার বা তাঁর অংশাবতার নন কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তির অভিব্যক্ত রূপ বা সত্তা, (সমস্ত জীবই ঈশ্বরের সৃষ্ট ও তাঁর অংশ কারণ তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের সঙ্গে ওতঃপ্রোত) তাহলে মনে হয় অবতার ভাবনার মধ্যে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ধারণা রয়েছে। অবতারগণ কেউই মনুষ্যরূপে ঈশ্বর নন কিন্তু ঈশ্বরে একীভূত সত্তা। বাস্তবিক পুরাণ রচয়িতা ও পৌরাণিক যুগের ধর্মসম্প্রদায়ের নেতাগণ (যাঁদের অস্তিত্ব আজও কম নেই) কি গূঢ় উদ্দেশ্যে এই অবতার চিন্তা করেছিলেন আজ আর তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যাবে না। তবে স্বার্থ চরিতার্থর জন্যই হোক, সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে দলে টানার জন্যই হোক, এসব উদ্দেশ্যর সঙ্গে পরোক্ষভাবে অবতার-তত্ত্ব একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তা হলো অতিমানস সত্তা বিশিষ্ট মহাপুরুষদের ঈশ্বরীয় ভাব। রামচন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত (কল্কিদেবকে বাদ দিয়ে এবং অবতার হিসাবে আখ্যাত না হলেও যীশুখ্রীষ্ট, হজরত

মহম্মদ, নানক প্রভৃতিদের ধরে) মহাপুরুষদের দিব্য জীবন ও ভাবাদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও এঁদের কর্মকৃতি ও সাধনালব্ধ ঐশ্বরিক বাণী মানব বিকাশের পথে হয়তো এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

রঘুপতি রাম তাঁর সুমহৎ চরিত্র, নবদুর্বাদলশ্যাম রূপ, অতুলনীয় সত্য পরায়ণতা, ও গভীর মানব প্রেম নিয়ে জনমনে ঈশ্বররূপে আরাধ্য। রাম-নাম জপ করে, রামমূর্তি ধ্যান করে কোনো কোনো সাধক ঈশ্বর সাজুয্য লাভ করছে। বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন শান্তির দৃষ্টান্ত, তাঁর স্থিতপ্রাজ্ঞতা ও গীতা-কথা এবং সুদর্শনচক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিয়ে যতটা না জনমন অধিকার করেছেন তার চেয়ে মুরলী মনোহর মূর্তিতেই তিনি কৃষ্ণ ভগবান হিসাবে সমধিক পূজ্য। মানুষ এভাবেই ভক্তির অর্ঘ্যে তাঁকে উপাসনা করে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করে, অন্তরে কৃষ্ণ-সংকীর্তন শুনে পরমানন্দ বা মুক্তি লাভ করছে।

অভূতপূর্ব ক্ষমা, ত্যাগ ও প্রেম পূর্ণ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণের জন্য সিদ্ধার্থ ভগবান বুদ্ধরূপে মান্য। তাঁর নির্দেশিত জ্যোতির্ময় পথ বহু মানুষের নির্বাণ বা মুক্তির সহায়ক হয়েছে।

চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভক্তির অর্ঘ্যে পূজা করে মানুষের আত্মিক বিকাশ ঘটছে, তার পরমানন্দ লাভ হয়েছে। তিনি ভগবানের মূর্ত বিগ্রহরূপে মানুষের কাছে আদৃত।

যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি মহামানবগণ তাঁদের অমৃতময় চরিত্র বৈশিষ্ট্য মানুষের হৃদয় আসনে নিয়ে মুক্তির দিশারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানরূপে পূজিত হচ্ছেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁর অনুপম সরলতা, অনাসক্তি, ঈশ্বর পরায়ণতা, মানব প্রেম ও চেতনা-দায়ী বাণী দিয়ে ভগবান রূপেই মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। এরা কেউ ঈশ্বরের অবতার নন (যদিও রামকৃষ্ণকে 'অবতার' রূপে কল্পনা করা হয়েছে) কিন্তু মানব-মুক্তির দিশারী। এই সকল মহামানব ছাড়াও আরও বহু অতিমানস সত্তা বিশিষ্ট মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে জগতের কল্যাণে আপনাদের উৎসর্গ করে গেছেন।

ধর্মসম্প্রদায়ী নেতৃবৃন্দ এঁদের 'অবতার' আখ্যা দেয়নি কিন্তু এই সকল মহাপুরুষরাও ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন এবং এঁদের অবদানও কম ছিল না। অনাগত দিনে হয়ত আরও মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হবেন ঈশ্বরের অভিলাষে মানব বিকাশের জন্য নতুন আলোকবর্তিকা সঙ্গে নিয়ে। এই চক্র সমানে চলবে, যত দিন লীলাময় ভগবান তাঁর লীলায় মগ্ন থাকবেন।

'অবতার তত্ত্ব' হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ীদের ভক্তির আতিশয্য জনিত কল্পনা অথবা স্ব স্ব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে নিয়ে তাদের অস্বাভাবিক কল্পকথা রচনা কিম্বা তাদের উপলব্ধ সত্যের প্রচার—এ সকল বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা পূর্ব অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এ সব জিজ্ঞাসার বিচার যুক্তি ও অনুভূতির সঙ্গে করা দরকার। কেবল আপন আপন মতবাদ সিদ্ধ করার জন্য তর্ক করলে তর্কযুদ্ধই হয় কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এখন অবতার ভাবনা যে কল্পনা-সর্বস্ব সে সম্পর্কে যে যুক্তিগুলি রয়েছে সেগুলির আলোচনা করা যাক।

(১) অবতারবাদ মূলত : পৌরাণিক যুগের কল্পনা-প্রসূত ভাবনা এবং শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হলেও অন্য বেদগ্রন্থে অনুপস্থিত। এ মতের স্বপক্ষে বলা যায় যে ঈশ্বর অখণ্ড অসীম সত্তা বিশিষ্ট, তিনি সর্বশক্তিমান পরমাত্মা, তিনি অজর, অমর, অব্যয় ; তাঁর পক্ষে ক্ষুদ্র মানব জন্মের প্রয়োজন কেন ? ঈশোপনিষদে বর্ণিত হয়েছে যে ভগবান সর্বব্যাপী, স্থূলদেহ রহিত, শুদ্ধ, স্বয়ম্ভু, অপাপবিদ্ধ ও সত্য প্রকাশ।

"স পর্য্যগচ্ছ ক্রমকায়মব্রনম স্নাবিয়ং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পারভূ : স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্য তোহর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।
(ঈশ : ৪০, ৮)

এর স্বপক্ষে ধর্ম সম্প্রদায়ীরা যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে ঈশ্বর যদি শক্তি

এবং তিনি যদি অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সবই করতে পারেন তবে মনুষ্যরূপে জন্মাতেই বা পারবেন না কেন? ধর্মসম্প্রদায়ীদের যুক্তি অন্যপক্ষ খণ্ডন করে বলে যে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান এবং তিনি যদি অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সবই করতে পারেন তবে মনুষ্যরূপে জন্মাতেই বা পারবেন না কেন? ধর্মসম্প্রদায়ীদের যুক্তি অন্যপক্ষ খণ্ডন করে বলে যে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তবে অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে মনুষ্যদেহ গ্রহণ না করেও তিনি মানুষকে দর্শন দিতে পারবেন না কেন? জগৎ প্রভু 'অবতার' না হয়েও জগৎ রক্ষা করতে পারবেন না কেন?

(২) মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, ও বামন অবতার কল্পনা আদৌ বিজ্ঞান সম্মত নয় এবং অস্বাভাবিক। এঁদের সম্পর্কিত যে কাহিনী রয়েছে তার মধ্যে অলৌকিকত্বের চেয়ে বিসদৃশভাবই প্রকট হয়েছে। ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করে এ সব উদ্ভট কল্পনা বিস্ময়কর এবং মনে হয় ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থতার জন্যই এসবের অবতারণা।

(৩) পুরাণাদি গ্রন্থানুসারে 'সত্যযুগ' সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ যুগ। কিন্তু এই সত্যযুগেই পাঁচ অবতারের আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে যাঁরা দানব রাক্ষসদের অত্যাচার দমন করে পৃথিবীর রক্ষার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্যাপারটি তাই স্ববিরোধী।

(৪) কৃষ্ণের রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, পরস্ত্রী সম্ভোগ ইত্যাদি কাহিনীর উপর যতই কেন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করা হোক, এগুলি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের অর্থাৎ অবতারের গুণ হতে পারে না। মনে করা যদি যায় যে ঈশ্বর কৃষ্ণ রূপে মনুষ্যদেহ ধারণ করে জন্মেছিলেন, তাহলে ঐ সব অসামাজিক কাজ যা করেছেন তার উপস্থাপনা মানুষকে কখনই সৎ হতে উৎসাহিত করবে না বরং পাপ-সলিলে ডুবিয়ে দেবে। তাই এগুলি মিথ্যা-কল্পনা বলেই মনে হয়। এ ধরনের অবতার-কল্পনা মেনে নেওয়া যায় না। ধর্মসম্প্রদায়ীদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এ সবের অবতারণা করা হয়েছে।

(৫) গৌতমবুদ্ধকে 'পাষণ্ড' অবতার বা 'নাস্তিক' অবতার বলা ঈশ্বরের

প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই করা হয়েছে বলে শ্রুতিপন্ন হয়।

(৬) বামন অবতারের কাহিনীর আগাগোড়া নির্দয় ভগবান ও চালাক ভগবানের কথা। এসব কাহিনী কখনই মহান ঈশ্বরের গুণবৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

(৭) কল্কি অবতারের কাহিনী কল্কি-পুরাণে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে তা পুরাণকারের উদ্ভট কল্পনা বলে বিবেচিত হয়। পুরাণকার আপনাকে কল্কির আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে উপস্থাপিত করলেও কাহিনীটিতে তার দুরদর্শিতার কোনোও পরিচয় মেলে না।

পৌরাণিক অবতার-ভাবনা যে কল্পনা-প্রসূত তার সমর্থনে উপরে উল্লিখিত কারণগুলির অবতারণা মনে হয় অযৌক্তিক নয়।

অবতার তত্ত্ব পৌরাণিক ধর্মচিন্তার ফলশ্রুতি। এর দ্বারা বিশেষ ভাবে ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। অবতার কল্পনা মানুষের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা অনেক খেলো করে ফেলেছে।

তবে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের অবতার রূপে আখ্যাত মহাপুরুষদের ঈশ্বর ভাবে উপাসনা করে সাজুয্য লাভ যে করেনি তাও নয়।

অবতার কল্পনার সবচেয়ে যে কুফল আজ প্রকটিত তা হলো পুরাণকারের পথ অনুসরণ করে আজও সেই একই পদ্ধতিতে ধর্ম সম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের গুরুদের অবতাররূপে আখ্যাত করে চলেছে। বলা বাহুল্য ধর্ম-সম্প্রদায় ও সাধক গুরুর মতবাদ ও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সব মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সব অবতারগণ (?) প্রথমে সাধক, পরে সিদ্ধ এবং শেষে তাঁদের ভক্তদের মনের মণিকোঠায় ক্রমোন্নতি লাভ করে 'অবতার' রূপে প্রচারিত হন।

পৌরাণিক অবতারবাদের ভিত্তি কোনো সত্য উপলব্ধির উপর গড়ে উঠেছিল কিনা তার সঠিক প্রমাণ মানুষের কাছে নেই এবং যুক্তিতে বা তার ধারণাতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার এ বিষয়ও অস্বীকার করা

যায় না যে অবতার-ভাবনা নিছক কল্পনার রঙীন আলেখ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য ! স্বার্থগন্ধী কল্পনা ও স্থূল-ধারণাকে ছাপিয়ে সত্যের জ্যোতির্ময় আলো না জানি কখনো কোনো অজ্ঞাত রহস্য জালে বদ্ধ হয়ে অবতার-তত্ত্বকে আলোকিত করে ফেলেছে। ঈশ্বরের অবতার রূপে কোনো জীবের অবয়ব নিয়ে ভগবানের আবির্ভাব সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও যুগে যুগে অতি মানস সত্তা বিশিষ্ট মহাপুরুষেরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন, তাঁদের কর্মকৃতির আলোয় জগৎ-জীবনকে আলোকিত করে চলে যাচ্ছেন। এঁরা বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন হয়ে আসেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। আত্মজ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে জীবন-সাধনার প্রভায় এঁরা ঈশ্বরে একীভূত হয়ে বুঝি ঈশ্বরই হয়ে যান।

পরিশিষ্ট

সাধারণ ধারণা এই যে 'অবতার বাদ' পুরাণ ভিত্তিক অর্থাৎ তেমন প্রাচীন নয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। হিন্দু-ধর্ম মতে অবতার বাদ বহু প্রাচীন কাল থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা ঈশ্বর। একমাত্র তিনিই জীবোদ্ধার মানসে দয়া পরবশ হয়ে পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে প্রত্যেক কল্পে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পুরুষ মূর্তি এবং দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি স্ত্রী-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাঁর লীলা সম্পাদন করেন। অবতার সম্বন্ধে এই হলো শাস্ত্রীয় প্রতিবেদন। যে দেশে, যে সময়ে, যে রূপে যে মূর্তিতে অবতীর্ণ হলে জীবের কল্যাণ সাধিত হয় সেই দেশে, সেই কালে ও সেই মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে পরমেশ্বর 'অবতার' রূপে কৃপা বিতরণ করেন।

মানুষের এই 'অবতার ভাবনা' অনাদিকালের। হয়তো তার নানা রকম বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ ঘটেছে কালে কালে। বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাপুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থাদিতে অবতার সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী, নানা ধারণা ও কল্পনা রূপায়িত হয়েছে দেখা যায়।

শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়ে প্রথমে মনুর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জলাশয়ে স্থাপন করতে বলেন। মনু সেইরূপ করলে মৎস্য ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে জলাশয়কে পরিব্যাপ্ত করেন। "স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৮।৫] অর্থাৎ সেই মৎস্যরূপী ভগবান জলরাশিকে ব্যাপ্ত করে ফেললেন। মৎস্য পুরাণের উপাখ্যান সম্ভবত এই বর্ণনারই পল্লবিত রূপ।

শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র উল্লিখিত আছে "স কূর্ম আস" অর্থাৎ তিনি

কূর্ম হলেন। দেবগণ ও অসুরদের বিরোধ উপস্থিত হলে ভগবান বামনরূপ পরিগ্রহ করে অসুরদের পরাভূত করলেন। ঐ গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাবে "বামনো হ বিষ্ণুরা স [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।২।৩৫]
কেনোপনিষদে বলা হয়েছে—

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানা
মুমাং হৈমবতীম্। [কেনোপনিষৎ ৩।১২]

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অসুরগণের যুদ্ধে ভগবান দেবতাদের বিজয়ী করেছিলেন। দেবতারা অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেরাই জয়লাভের হোতা এই অভিমান করায় তিনি (পরমাত্মা) অদ্ভুত রূপ ধারণ করে দেবগণের অভিমান খণ্ডন করেন এবং ইন্দ্রকে উমারূপ ধারণ করে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পূর্বে এই যোগ সূর্যকে বলেন। "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম। [গীতা : ৪।১]

ভগবান যে রূপে সূর্যকে যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সূর্যদেবের অন্তর্যামী রূপের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে পরিস্ফুট হয়েছে—"য এষো-হন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো' দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্য কেশ আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণ.[ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৬।৬]

অর্থাৎ এই যে আদিত্য দেবতার মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষের প্রকাশ হয়েছে, তাঁর শ্মশ্রু সুবর্ণময়, তাঁর কেশদাম সুবর্ণময় তাঁর নখ থেকে সর্ব অবয়বই সুবর্ণময়।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের মৎস্য কূর্মাদি অবতার সম্পর্কে টীকাকার শ্রীধর স্বামীর বক্তব্য—

"সেই ভগবান পদ্মপত্রে অবস্থান করে দেখতে পেলেন, তিনি মনে করলেন —ইহা যাতে অবস্থান করে সেরূপ অধিষ্ঠান আছে। তিনি বরাহরূপ ধারণ করে জলে নিমগ্ন হলেন এবং পৃথিবীকে সলিল মধ্য হতে উদ্ধার করলেন।"
[বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকের টীকা শ্রীধর স্বামীকৃত]

আবার একই পরমেশ্বর আপন উপাধিভূত মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণাদি ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ ধারণ করে থাকেন। বেদে বহু-স্থানে ব্রহ্মার উল্লেখ আছে। তিনি ধাতা ও প্রজাপতি রূপে বর্ণিত। যথা,

"ভূরিত বৈ প্রজাপতিঃ। ইমাম জনয়ত।" [শত পথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪] ও "ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ" [ঋগ্বেদ]

নারায়ণ উপনিষৎদের ২।১২ শ্লোকে উল্লিখিত আছে "ব্রহ্মা দেবানাং পদবী" অর্থাৎ ব্রহ্ম, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর বিভূতি নিয়ে বিরাজ করছেন। অবশ্য হিরণ্যগর্ভ বা বিরাটরূপী ব্রহ্মা ঈশ্বর নন। তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব। ঈশ্বর কোটির ব্রহ্মা এঁদের থেকে ভিন্ন।

বেদে শিবরূপে পরমেশ্বরের অবতারের কথা কীর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদে শিব রুদ্ররূপে অনুভাবিত। শিব ও রুদ্র যে একই দেবতা সে কথা যজু-র্বেদের রুদ্রসূক্ত 'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ' মন্ত্রে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণু পূর্বকল্পের মতো মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি শরীর অবলম্বন করে অন্য মূর্তি ধারণ করেন।

[বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮]

দেবী ভাগবত পুরাণে প্রথমে দেবীকেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী বলা হয়েছে। এমন কি তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও নিয়ন্ত্রী। তিনি অনাদি পরমা প্রকৃতি মহাশক্তিরূপিণী জগদীশ্বরী। আবার পরবর্তী অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সকল পুরুষ ও স্ত্রী অবতারই এক পরমাত্মার বিভিন্ন রূপ। সুতরাং যোগিগণ তাঁদের পৃথক পৃথক মনে করেন না। "...অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে।" [দেবী ভাগবত ৯।১।১১]

আবার ঐ একই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে দুর্গা, কালী এঁরা মহাশক্তি স্বরূ-পিণী অগ্নির দাহিকাশক্তির মতনই পরম ব্রহ্মস্বরূপ শিব হতে ভিন্ন নন। "সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তিযথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা" [দেবী ভাগবত ৯।১।১০]

তাই পরমেশ্বর কখনও বা কেবল পুরুষ মূর্তিতে কখনো বা কেবল স্ত্রী মূর্তিতে, কখনও বা স্ত্রী-পুরুষ উভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হন। যেমন শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি।

পরমব্রহ্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ তাঁর অংশ নেই ; তবু স্বকীয় উপাধিভূত মায়াকে বশীভূত করে সেই শক্তির দ্বারা কখনও পূর্ণরূপে কখনও অংশকলা যুক্ত-রূপে কখনও বা অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ষাদি সমভিব্যহারে অবতীর্ণ হন।

উপরি লিখিত আলোচনাগুলি একত্রিত করে অনায়াসে মন্তব্য করা চলে যে অবতারবাদ বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়েছে এ ধারণা হয়ত ঠিক নয়। তবে সম্ভবত পৌরাণিক যুগেই এই মতবাদ সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত হয়েছিল।

এই সূত্র ধরেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনেরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে অবতার-বাদ চিরন্তন।

অবতার যে মাত্র দশজন এরূপ কথা বেদপুরাণাদি গ্রন্থে কোথাও নির্ধারিত করা হয়নি। তবে পুরাণগুলিতে দশ অবতারের কথা বিশেষভাবে প্রচার হওয়ায় সাধারণ ভাবে ধারণা করা হয়েছে যে অবতার দশটি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। দেশে দেশে যুগে যুগে জীব জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন অনুভূত হলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে 'অবতার' আবির্ভূত হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও পরাশর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অবতার অনেক।

ভগবানের অবতার যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হয়েছেন তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জগৎ ও মানব কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। হয়তো সেই অবতার পুরুষ 'অবতার' রূপে বর্ণিত হন নি।

উপরিলিখিত উদ্ধৃতি ও বক্তব্যগুলি শাস্ত্রজ্ঞ গুণীজনের দ্বারা উপস্থাপিত অবতার বাদ সম্পর্কে শাস্ত্র প্রমাণও বলা যায়। অন্ততঃ পণ্ডিতরা তাই মনে করেন। শাস্ত্রের মতো বা সিদ্ধান্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞদের অভিমতের প্রতি কোনোও বিরুদ্ধ মত পোষণ না করে অথবা তর্ক-বিতর্কের পথে

পদার্পণ না করে (কারণ এ সম্পর্কে যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে কিন্তু তর্কের প্রয়োজনই বা কি) এবং ঐ বক্তব্যকে অস্বীকার না করে এ কথা পরিষ্কার ভাবে বলা যেতে পারে যে ঈশ্বরের অবতার তত্ত্ব উদ্ভট কল্পনা, অস্বাভাবিকত্ব, অভিসন্ধিমূলক এই সব বিসদৃশ ব্যাপার গুলি সত্ত্বেও ঈশ্বর বিভূতিতে অভিব্যক্ত মহামানবগণের মধ্যে এক সত্যপোলব্ধির আলোকে বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের পথে হয়তো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যাঁদের বলা যেতে পারে অতিমানস সত্ত্বা বা অবতার এবং বিশ্বচরাচরের স্থিতি, তার কল্যাণ ও ঈশ্বরের লীলা বিলাসের জন্যই বুঝি তা ক্রিয়াশীল।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য়)—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত
২য় সংস্করণ ১৯০৯

২। শতপথ ব্রাহ্মণ—

৩। ছান্দোগ্য উপনিষৎ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত
উদ্বোধন কার্যালয়।

৪। মৎস্য পুরাণম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

৫। কূর্ম পুরাণম্ ঐ

৬। বরাহ পুরাণম্ ঐ

৭। বামন পুরাণম্ ঐ

৮। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণম্ ঐ

৯। কল্কি পুরাণম্ ঐ

১০। রামায়ণ—বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পাণিসীকর সম্পাদিত
(বোম্বাই ১৯০৯)

১১। মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত

১২। আলোক তীর্থ—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল।

১৩। অবতারবাদের শাস্ত্র প্রমাণ—ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্য
উদ্বোধন ৬১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৬

১৪। ভারতের মুনিঋষি (১ম)—দীপ্তিময় রায়

১৫। Modern Incarnation of God—অধরচন্দ্র দাস

১৬। জাতক (১ম)—ঈশানচন্দ্র ঘোষ

১৭। দেবী ভাগবতম্

১৮। খিল হরিবংশ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

১৯। পালি দীর্ঘনিকা—(কেবদ্ধ সূত্ত)

২০। জীবনী সংগ্রহ—গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।